ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ষড়বিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

ষড়বিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

[মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—পয়ঁষট্টি টাকা

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2022]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-94394-12-4

ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ধৃতং প্রেম্না ষড়বিংশ খণ্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৭৫ বাংলা সালে। দীর্ঘ তিপ্পান্ন বৎসর পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত। আশাকরি, সজ্জন পাঠকবর্গের নিকট ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পত্রাবলী সম্বলিত এই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তক অখণ্ডগণের নিকট পবিত্র গ্রন্থ স্বরূপ, যাহাতে অখণ্ডগণের বহু সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

কেবলমাত্র অখণ্ডগণ নহেন, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির সুমহান আদর্শ এই পুস্তকে তাঁহার লিখিত পত্রাবলীতে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত যাহা মানবজীবনে কর্ম্মের সঠিক দিশা প্রদর্শন করে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণা ও আশীর্ব্বাদে আজ "ধৃতং প্রেম্না" ষড়বিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ইতি—

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী

বিনীত নিবেদক
তপন ব্রহ্মচারী

এই ষড়বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

ষড়বিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ষড়বিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সহজ সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ষড়বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—

পৌষ, ১৩৭৫ বাংলা

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

উপহার

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ষড়বিংশ খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)
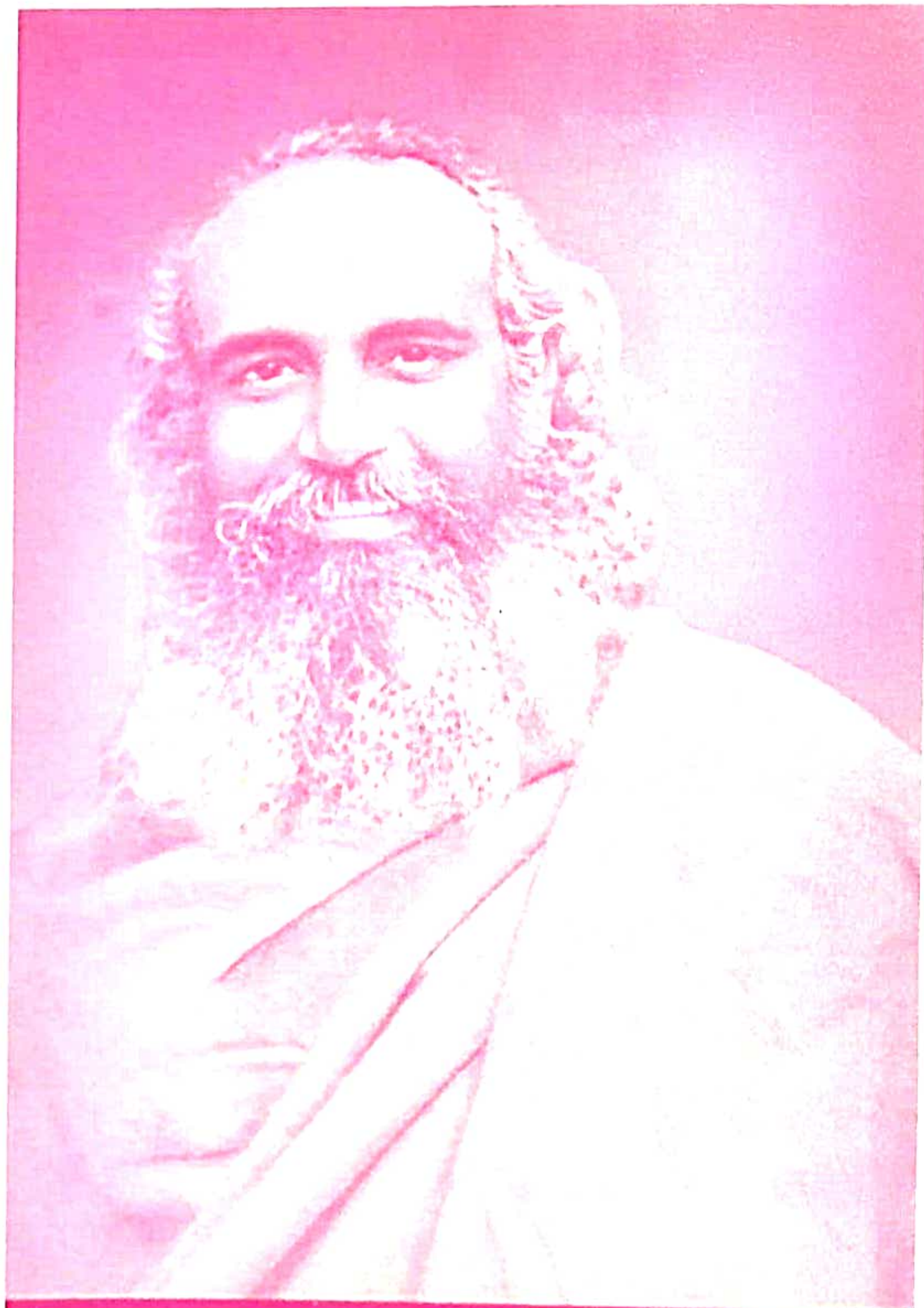
হরিওঁ বারাণসী
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কুমারীর জীবনে একভাবে সাধন-ভজন করিয়া আসিয়াছ, এখন বিবাহিতা হইয়া নানা পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া মাঝে মাঝে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িতেছ। কিন্তু মা, ভয় করিবার কিছুই নাই। মনে মনে অবিরাম ভগবানকে ডাকিতে থাক। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম তুমি দীক্ষাসূত্রে পাইয়াছ, সেই নাম কখনো নিস্ফল হয় না। তুমি সর্ব্বক্ষণ নাম করিতে থাক। দেখিবে, সকলের

অজ্ঞাতসারে পারিবারিক পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন আপনা আপনি সুরু হইয়া যাইবে।

নূতন সংসারের কতকগুলি অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া হয়ত সাময়িক ভাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে তোমার মনোগতির বা দার্শনিক তত্ত্বোপলব্ধির মধ্যে কোনও আপোষ-রফাকে স্থান দিলে চলিবে না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে খুশী করিবার জন্য কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে, আজীবন তোমাকে উহাই করিতে হইবে। উত্তম সাধন-পদ্ধতির অধিকারীর পক্ষে অধম সাধন-পদ্ধতিতে লাগিয়া থাকার কোনও অর্থ হয় না মা। কিন্তু স্বামীর সংসারে অশান্তি আনয়ন এদেশের বধূদের ঐতিহ্য নহে। এজন্য মনে প্রাণে বৈদান্তিক হইয়াও শ্বশুরকুলের পৌরাণিক উপাসনা-গুলিতে বাধা সৃষ্টি করা হইতে তোমাকে বিরত থাকিতে হইবে। তোমার আদর্শ-নিষ্ঠা প্রবল ও ভগবদ্ভক্তি গভীর হইলে তুমি আস্তে আস্তে তোমার সংসারের মধ্যে একটীর পর একটী করিয়া মানুষের মনের গতি এক এবং অদ্বিতীয়ের অভিমুখী করিতে পারিবে। তবে এই ব্যাপারে তোমার স্বামীর মনকে তোমার মনের ও মতের অনুরূপ করিয়া তোলাটাই তোমার সর্ব্বকর্ম্মের প্রথম সোপান এবং সর্ব্বসিদ্ধির প্রথম প্রতিশ্রুতি। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীকে নিজের মতে ও নিজের পথে আনিতে পারে, বিশেষ করিয়া স্বামী যেখানে এখনও অদীক্ষিত।

বহুদেববাদ ভারতের ধর্ম্মজগতে বৈচিত্র্য আনিয়াছে, কাব্যের দৃষ্টিতে তাহা মনোহর, রসের দৃষ্টিতে তাহা চিত্ততোষক, কিন্তু জাতীয় দৃষ্টিতে তাহা অনৈক্যবর্দ্ধক। অন্যান্য দেশের বহুদেববাদের সহিত ভারতীয় বহুদেববাদের একটা গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে এইখানে যে, সুপ্রাচীন বিশ্বদেববাদ ভারতীয় বহুদেববাদের অভিভাবক স্বরূপে বসিয়া আছে। ইহারই দরুণ য়ুরোপে যখন অনায়াসে প্রাচীন দেবতারা হাতুড়ীর ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের অবাধ বিস্তারের রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে বহুমন্দির কলুষিত, লুণ্ঠিত, চূর্ণীকৃত হওয়া সত্ত্বেও দেবতাকে শূন্যে মিশাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বিশ্বের সব দেবতা এক দেবতা, বিশ্বের সব দেবতাতেই এক দেবতা বিরাজিত, বিশ্বের যে-কোনও দেবতাতে বিশ্বের সমস্ত দেবতা বাস করেন, অনুভূতি-মূলে এই যে তত্ত্ব ভারতীয় বহুদেব-পূজকদেরও বিশ্বাসের ভিত্তিমূল রচনা করিয়াছে, তাহারই মহিমায়, প্রাচীন প্রথার পূর্ণ যে বিলোপ অন্য দেশে সম্ভব হইয়াছে, নিদারুণ সন্ত্রাস দিয়াও ভারতে সেই বিলোপ সম্ভব করা যায় নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ-এর দেশে তাই আজও কত দেবমন্দির শোভা পাইতেছে। ইহারা ভারতীয় আরাধনা- পদ্ধতির এক বিচিত্র প্রদর্শনী, যাহার প্রতি সহানুভূতি-শীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কাব্য, রস, নানারূপ, চিত্তভাব- তরঙ্গ ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ওঠে।

কিন্তু তথাপি বলিব, ইহা সর্ব্ব-মানবের পরিপূর্ণ একত্ব বিধানের পথে পরিপন্থী এক শক্তি।

এদেশে বলপূর্ব্বক বহুদেববাদ প্রশমিত করিবার চেষ্টার কোনও ইতিহাস নাই, নজির নাই, সার্থকতাও নাই। আরব হইতে বহুদেববাদ একটী শক্তিশালী ধর্ম্মনেতার একজীবনের সংগ্রামময় অধ্যায়ের কতকটুকু সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার একটী কারণ এই যে, ভারতীয় বিশ্বদেববাদের মতন কোনও দার্শনিক উপলব্ধি বা সর্ব্বৎ খল্বিদং ব্রহ্মের মত কোনও এদ্বৈতসিদ্ধি সে দেশের প্রাক্তন সাধদের অবদানের মধ্যে ছিল না বা পাওয়া যায় নাই। একেশ্বরবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেখানে যে অস্ত্রের ঝনৎকার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাও গণনায় আনিতে হইবে। হজরৎ মহম্মদের মতন ধীর, স্থির, ধ্যান-পরায়ণ, সুবিচারক ক্ষমাশীল ব্যক্তির পক্ষে অস্ত্রধারণ আবশ্যক হইয়াছিল শুধু হননেচ্ছু শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মাত্র। ধর্ম্মীয় স্বাধীন মতবাদ প্রচারের ফলে তাঁহাকে যদি মরণাশঙ্কাসঙ্কুল উৎপীড়নের মুখে পড়িতে না হইত, তাহা হইলে তিনি হয়ত জীবনেও কখনো অস্ত্রধারণ করিতেন না। কিন্তু অস্ত্র এমনই একটা জিনিষ যে একবার হাতে তুলিয়া ধরিলে তাহাকে নামাইয়া রাখা কঠিন। পরশুরাম কারণাধীনে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হস্ত হইতে কুঠার বড় সহজে নামিতে চাহে নাই। এজন্যই ইসলামের পরবর্ত্তী ইতিহাস একটী বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তোমাদের দেশে ধর্ম্মের ব্যাপারে অস্ত্র-ধারণের অবকাশ কদাচ হয় নাই, কখনো হইবে না। তোমাদের দেশে বহুদেবপূজকদের মধ্যে কেহ কেহ কখনো কখনো নিজ নিজ পূজিত দেবতার ভিতরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে নিজ নিজ পূজিত দেবতাকে দেখিয়া থাকে। তোমাদের দেশে এই কথাকে অন্ততঃ মৌখিক স্বীকৃতি প্রত্যেকেই দেয় যে, সব দেবতাই এক জনের ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভিন্ন ভিন্ন গুণ মাত্র। তোমাদের দেশে এক দেবতার পূজকেরা সৈন্যদল লইয়া অন্য দেবতার পূজকদিগকে নিধন করিয়া নিজদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিতে আগ্রহী নহে, কখনো আগ্রহী ছিল না, কখনো আগ্রহী হইবেও না। এইরূপ যেখানে পটভূমিকা, সেখানে বলপূর্ব্বক বহুদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার কোনও কল্পনা কাহারও মনে জাগিতে পারে না। কেন না, ইহা স্থানিক প্রকৃতির স্বভাব-ধর্ম্মের বিরোধী।

সুতরাং তুমি কুমারী অবস্থায় এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভজনসাধনের পরমোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইবার পরে বহুদেবপূজক এক পরিবারে গিয়া বধূরূপে উপনীত হওয়াতে তোমার যে কি নিদারুণ অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু ধৈর্য্য ধর মা। নিজের সাধন নিজে দৃঢ় প্রত্যয়ে করিয়া যাও, শ্বশুর-শাশুড়ীকে তাঁদের প্রাপ্য সেবা দিয়া যাইতে থাক, স্বামীকে স্বার্থলেশহীন নিষ্কাম সেবা দিয়া একেবারে অন্তরের অন্তর, আপনার আপন, জীবনের জীবন করিয়া লও। তাহার ফলে যাহা ঘটা সঙ্গত, অচিরকাল মধ্যে তাহাই ঘটিবে।

দেববিগ্রগুলিকে পরমেশ্বরে মনঃসংযোগ সাধনের এক একটা বিশেষ আলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়াতে সাধারণ ভারতীয় প্রত্যেকেই অন্যের পূজা-পদ্ধতির প্রতি অনাসক্ত উদারতা ও নির্ব্বিদ্বেষ সহনশীলতা দেখাইয়া থাকেন। ইহা ভারতীয় মনের একটা চমৎকার প্রশংসনীয় দিক। কিন্তু এক একটী পূজামন্দিরে কয়েক গণ্ডা, কয়েক ডজন বা কয়েক কুড়ি বিভিন্ন দেব-বিগ্রহ আনিয়া জড় করার ভিতরে যে নিজের ইষ্টে একরূপ অবিশ্বাস সূচিত হয়, একথা পূজকেরা বুঝিতে পারেন না। কাকীমা বলিয়াছেন লক্ষ্মী পূজা করিতে, আসিলেন মা লক্ষ্মী। জ্যেঠাইমা বলিয়াছেন দশভূজা পূজিতে, আসিলেন মা দুর্গা। মাষ্টার মশাই বলিয়াছেন বাণী পূজা করিতে, আসিলেন মা সরস্বতী। পুরুত ঠাকুর বলিয়াছেন গণেশ পূজা করিতে, আসিলেন মূষিকবাহন গজানন। গ্রহাচার্য্য বলিয়াছেন নবগ্রহের পূজা করিতে, আসিলেন নয়টী বিচিত্র গ্রহ। এইভাবে পূজাঘরের বেদীর উপরে কত দেবতার যে দখলী সত্ত্ব হইয়া গেল, বলিবার নহে। স্থানাভাবে যখন ইঁহাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল, তখন কাহাকে রাখি, কাহাকে ফেলি, ইহা এক দারুণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। আমি এই জন্যই বলি, পূজার বেদীতে মাত্র একজনকেই রাখ। ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্বমত, সর্ব্বপথকে স্বীকৃতি দেয়,—ওঙ্কারকেই একমাত্র পূজার বেদীতে বসাও।

সমন্বয় ও ঐক্য এই ভাবেই আসিবে, মহাবলপ্রবুদ্ধ পৌরুষ-দীপ্ত জগজ্জয় এই পথেই ঘটিবে। এই বিশ্বাসে চিরস্থির থাকিয়া

নিজের সাধন নিজে করিয়া যাও। অন্যের পূজায়, অর্চ্চনায়, ধ্যানে, ধরণায় কোনও প্রকার বাধার সৃষ্টি করিও না। পরিণামে তোমার নীরব একাগ্র একনিষ্ঠ সাধনই জয়যুক্ত হইবে।

যাঁহারা নানা দেবতার পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই। তাঁহাদের নিষ্ঠাভঙ্গ করিবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার মূর্খতা মাত্র। যে যেভাবে ভগবানকে ডাকিয়া শান্তি পায়, সে সেভাবে ডাকুক। অকপট হৃদয়ে ডাকিতে থাকিলে সে একদা ওঙ্কারেই আসিয়া পৌছিবে। সকলকে যেই পবিত্র উন্নতিতে একদা আসিতেই হইবে, তুমি সেই স্থানেই নিজের মনটাকে বিকাইয়া দাও, বিলাইয়া দাও, ডুবাইয়া দাও। বিশ্বের কাহারও সহিত তোমার অমৈত্রী নাই, জগতের সকলেই তোমার পরম আপন। তোমার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম,—অন্যের প্রতি আক্রোশের, রোষের, বিদ্রোহের, বিরূপতার, অসহনশীলতার তোমার কোনও যুক্তি নাই।

মনকে শান্তিময়ী এই স্থিতিটিতে পৌছাইয়া দিয়া তুমি বাহিরে সকলের প্রতি সমব্যবহার কর এবং অন্তরে নিরন্তর নিজ ইষ্টের নাম জপ কর। ওঙ্কার-মহামন্ত্রে যাহার দীক্ষা হইয়াছে, সে কখনো সাধারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মতন অসহিষ্ণু হইয়া নিজ আচরণের দ্বারা অন্যের অন্তরে ক্লেশ উৎপাদন করিতে যায় না কিন্তু অপরকে খুশী করিবার জন্য নিজের অন্তরের ধন ওঙ্কার-সাধনাকে সে পরিত্যাগও করে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ বারাণসী

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। উত্তর দিবার অবসর ছিল না। দূর পাল্লার ভ্রমণ শীঘ্র আরম্ভ হইবার কথা। এজন্য দুদিনের জন্যও যেখানে আসিতেছি, স্তূপীকৃত মুলতুবী কাজ করিতে হইতেছে। বারাণসীতে তোমাদের মজুত পত্র-সংখ্যা দুই হাজারের উপরে।

প্রথমতঃ একটী পল্লীকে শক্ত করিয়া ধর। নামজপ করিতে যেমন একটী মন্ত্রই জপিতে হয়, বহু মন্ত্র নহে, এ-ক্ষেত্রেও তোমরা নিষ্ঠার সহিত একটী গ্রামকেই ধরিবে, ব্যাপক কাজ করা যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ব্যাপক কাজ করিতে হইলেও আগে একটা ঘাঁটী তৈরী করিতে হয়। যুদ্ধ-কার্য্যেই বল আর প্রচার-কার্য্যেই বল, ইহা কার্য্যকর কর্ম্মনীতির একটা প্রধান অঙ্গ। সমগ্র আরব জুড়িয়া নিজের ধর্ম্মকে প্রচারিত করিবার পূর্ব্বে হজরত মহম্মদকে মদিনায় একটী নির্ভরযোগ্য কর্ম্মকেন্দ্র গড়িতে হইয়াছিল। সামরিক পরিভাষায় ইহা ঘাঁটি, ধর্ম্মীয় পরিভাষায় ইহা তীর্থ, সামাজিক পরিভাষায় ইহা আশ্রয়। তোমাদিগকেও তেমন সমগ্র জেলা জুড়িয়া যদি কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম একটী গ্রামকে পূর্ণতঃ কব্জায় আনিতে হইবে। ইহার অন্যথা

হইতে পারে না। একটী রাজ্যকে বশে আনিতে হইলে অন্ততঃ একটী জেলাকে পূর্ণতঃ অধিকারভুক্ত করা চাই। আমি কখনও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করি নাই। সুতরাং রণনীতি আমি বুঝিব, এরূপ অনুমান করা চলে না। কিন্তু আমি নানা গ্রামে, নানা জেলায়, নানা রাজ্যে মানুষের কুসংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং কাণ্ডজ্ঞান দিয়া আমি ইহা বুঝিয়াছি যে, ব্যাপক কর্ম্মাভিযান পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে একটী দুইটী পল্লীকে ধরিয়া প্রগাঢ়তম, প্রকৃষ্টতম, গভীরতম সংগঠন একান্ত প্রয়োজন। পুকুর কাটিতে হইলে তাহাকে যত বড় করিয়াই কাট, তাহার একটী স্থানকে গভীরতম করিতে হয়। এই গভীরতম স্থানটী পুকুরের জলের আশ্রয় বা ঘাঁটি। সমস্ত দেশ জুড়িয়া প্রবল বিরুদ্ধতা আসিলেও, এমন একটী গ্রাম চাই, যেটী তোমার পক্ষে সর্ব্বদাই ছায়াশীতল। দশবৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক খরা চলিলেও যেন তোমার পুকুরের ঐ একটা কোণায় কম পক্ষে দশ ফুট জল থাকে, এমন চাই। একটী গ্রামের কাজ বলিতে আমি ইহাই বুঝি।

একক প্রচেষ্টায় সংগঠন একটা মারাত্মক রকমের আত্মপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে নিজের শক্তির উপরে অবিশ্বাস ও ধিক্কার জন্মিতে পারে। তাহার ফল শুভ নহে। দশজনে মিলিয়া যখন একটা কাজ করে, তখন তাহার অসাফল্য আসিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, এবং এক এক জনের দুর্ব্বলতাকে অপরের সবলতার দ্বারা সংশোধিত করার সুযোগ ইহাতে মিলে। সকলের সবলতা একস্থানে প্রযুক্ত হইলে একদিকে পরস্পর পরস্পরের দুর্ব্বলতা

হরণে যেমন সহায়তা করে, তেমন অপরদিকে একটী চেষ্টা ধারাবাহিক প্রযত্নে অনবধারিত কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া যাইবার সুযোগ ঘটে। সাফল্য লাভের জন্য প্রচণ্ড উদ্যম চাই, ইহা সত্য। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্ম-পরিচালনের যোগ্যতাই হইতেছে যুদ্ধজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কারণ। কাহার ভাল ভাল অস্ত্র আছে, ইহাই যুদ্ধজয়ের শেষ কথা নহে, কে অনন্তকাল সমান বিক্রমে সংগ্রাম-পরিচালন করিতে পারিবে-ইহাই আসল কথা। রণনৈতিক অভিযানের সহিত ধর্ম্মীয় অভিযানের পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, রণবীরেরা ব্যবহার করেন অস্ত্র, ধর্ম্মবীরেরা ব্যবহার করেন আদর্শ। সৈনিকের হাতে অস্ত্র না থাকিলে যেমন যুদ্ধ নিরর্থক, অস্ত্রগুলি অস্ত্রাগারে ঘুমাইয়া থাকিলে যুদ্ধজয় হয় না, ঠিক তেমনি আদর্শ যদি ধর্ম্মসেনার জীবনমধ্যে রূপায়িত না হয়, আদর্শ যদি মুখের বুলি বা পুঁথির কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে পরাজয়ই একমাত্র চরম পরিণতি।

তোমাদের নগরকীর্ত্তনটা একটা Popular Movement, অখণ্ড-সংহিতা পাঠটা Intellectual. নামকীর্ত্তন তাহার সাঙ্গীতিক আকর্ষণে বিনা যুক্তিতেই সাধারণ লোকদিগকে প্রবল আকর্ষণে টানিয়া আনে। আর স্বাধ্যায় মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, বুদ্ধিকে নিশ্চিতই উদ্দীপ্ত করে। এই দুইটী কার্য্য যুগপৎ চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজন। তোমরা পাঠে ও কীর্ত্তনে সমান সমাদর রাখিও। পাঠকালে রক্ষ্য রাখিবে সুস্পষ্ট উচ্চরণের দিকে, ধীরমন্থর গতিতে কণ্ঠ-পরিচালনের দিকে, মধুর কণ্ঠে পাঠের

দিকে। তোমরা কীর্ত্তনের কালে লক্ষ্য রাখিও ধ্যানাবেশের আনুকল্য বিধানের দিকে। উচ্চ চীৎকার ও উদ্দণ্ড নৃত্য অপেক্ষাও কণ্ঠ-মাধুর্য্য এবং ধ্যানাবেশপ্রদায়ী আকর্ষণীয়তা তোমাদের সাফল্যের অধিকতর পরিপোষক হইবে, এই কথাটী ভুলিও না। কীর্ত্তনানন্দ আর ডন-কুস্তির আনন্দ এক শ্রেণীর নহে। কীর্ত্তনের লক্ষ্য ধ্যানাবেশের আনুকূল্য বিধানের মধ্য দিয়া মানুষের তপ্ত প্রাণে শান্তির অমিয় সিঞ্চন করা।

সমগ্র মনোযোগ দিয়া গ্রাম অঞ্চলে কাজ করিলে গ্রামের সেবা আস্তে আস্তে যে সহরে বিসর্পিত হইবে না, তাহা মনে করিও না। গৃহের পর গৃহ পর্য্যটন কর। নিজেদের অন্ন-সমস্যা, গ্রামের সামাজিক সমস্যা, জেলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা, কোনও সমস্যাকে গ্রাহ্য করিও না। যে যেখানে আছ আমার বিশ্বস্ত সন্তান, কাজ করিয়া যাও।, রণাঙ্গণের সৈনিকেরা নিদারুণ গোলাগুলি-বর্ষণের মধ্য দিয়াও কি নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের জন্য ছুটাছুটি করে না? কেহ যায় সংবাদ আদান-প্রদান করিতে, কেহ যায় আহতদের হাসপাতালে তুলিয়া আনিতে, কেহ যায় ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত রণ-সামগ্রী কুড়াইয়া আনিতে। ইহারা নির্ভীক কিন্তু সতর্ক। সতর্ক এইজন্য যে, দ্রুত না মরিয়া, যত দেরীতে সম্ভব মরিয়া, জীবৎকালটুকুকে সকলের পরমলক্ষ্য যুদ্ধজয়কে ত্বরান্বিত করিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। জেলা ব্যাপিয়া গুণ্ডামি,

রাহাজানি, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যালীলা ও পৈশাচিক কাণ্ড চলিয়াছে বলিয়াই তোমাদের পাঠ ও কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যাইবে না।

নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য বা অমিল থাকিলে কাজের বড় ক্ষতি হয়। অধিকাংশ স্থলেই অমিলের মূল কারণ হইতেছে অহমিকাসঞ্জাত ব্যক্তিগত-শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ। সেবকের পক্ষে এই বোধ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যে সেবক হইবে, তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাকে দিয়াই সেবার ঐতিহ্য জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে না। বরং তাহাকে দেখিয়া জগতে আরও কত নূতন নূতন সেবকের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে। সে যাহা, এই নূতনেরা তাহাই হইতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইতেই শ্লাঘাবোধ করিবে। অতএব তাহার নিজের হওয়া প্রয়োজন অমানী, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া বিনম্র, আত্মাভিমানবর্জ্জিত ভগবৎ-সেবক। তার চরিত্রে ভেজাল থাকিলে চলিবে না।

ইঙ্গিত মাত্র যাহারা কাজ করিতে চাহে বা পারে, তাহারাই কর্ম্মী হইবার যোগ্য। এক কথা যাহাদিগকে শতবার বলিতে হইবে, তাহারা ত' নেতার, সেনাপতির বা গুরুর পরমায়ুর অপহরণকারী মাত্র। তাহাদিগকে কর্ম্মী বলিব কেন? কথায় তোমরা সময় নষ্ট করিও না। কাজ করিতে গিয়া অনেক কথা কহিও না। অনেক কথা, অনেক বাক্যালাপ, অনেক আলোচনা না হইলে যাহারা কাজে নামিতেপারে না, তাহারা কর্ম্মি-পদবাচ্যই নহে। যে যত পার, কথা কমাও তর্ক কমাও, সমগ্র অন্তরটী দিয়া লক্ষ্যকে

সুনিশ্চিত রূপে অনুধাবন কর এবং এক কথায় দুই কথায় ইতি করিয়া দিয়া নিঃশব্দে নিরন্তর কাজে লাগিয়া থাক। যতটুকু কথা না বলিলে কাজে ক্ষতি হয়, মাত্র ততটুকু কথা তোমরা অবশ্যই বলিবে। কিন্তু বহু লোক একই কাজে লাগিলে কর্ম্মবিভাজনের প্রয়োজনে কাহাকেও নেতার স্থান কাহাকেও নীতের স্থান নিতে হয়। যে যেই স্থান নিতে পার, কর্ম্মের প্রয়োজনে তাহা নাও, কিন্তু ইহা যেন আত্মাহঙ্কারের বা ক্ষোভের কারণ না হয়।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় হইতেছে তোমাদের জীবন। এই কথাটী কেহ ভুলিও না। যে-কোনও স্থানে মতের অমিল ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিলে, তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যটুকু কোথায়, তাহার উপরে নিজেদের জেদকে স্থাপন করিও না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে কোথায় এবং কতটুকু, তাহা দ্রুত খুঁজিয়া বাহির করিবে। এইরূপ স্থলে তোমাদের মিলের পরিধির ভিতরেই তোমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে পরিচালিত করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা কদাচ ভক্তির ভান করে না। আসল ভক্তি অগাধ বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত হয়। দুর্লভ দুই চারিজন মাত্র যদি প্রকৃত বিশ্বাসী কেহ থাকিয়া থাকে, তবে ঐ অল্প কয়েকজনই আমার এক অক্ষৌহিণী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৫

(২৯-৪-৬৮ ইং)

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার লিখিত চিঠির অনুলিপি তুমি তোমার এক গুরুভ্রাতার সাহায্যে সর্ব্বত্র প্রেরণ করাইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। নিজে কাজ করিতে না পারিলেও অন্যকে দিয়া যথাসময়ে কাজ করাইয়া নেওয়া একটা বড় কথা।

আট নয়টী বাচ্চা নিয়া বিব্রত হইয়াছ। কেন মা, এতগুলি বাচ্চা আসিবারই ত' প্রয়োজন ছিল না। তোমাদের দুই জনের অন্তরের প্রেম এতদিনেও কি দেহের লালসাকে জয় করিতে পারে নাই? যখন পরস্পর প্রথম পরিচিত ও মিলিত হইয়াছিলে, তখন ত' অশরীরী প্রেমই করিতেছিল কাজ! তাহাকে দেহের সীমানায় নামাইবার পরে আর দেহাতীত করিতে পারিলে না?

ইহা পারা কিন্তু অসম্ভব নহে। তোমরা যে সহবাস কর, তাহা ত' নিতান্তই অভ্যাসের বশে। যেমন লোকে অভ্যাসের বশে পান খায়, দোক্তা চিবায়, চা খায়, মদ খায় অথচ ইহা না খাইলে মানুষ মরিয়া যায় না এবং ইচ্ছা করিলেই পান, দোক্তা, চা ও মদ না খাইয়াও দীর্ঘকাল বা সারা জীবন থাকিতে পারে। দুজনে

দুজনের দেহকে পূর্ণ রূপে চিনিয়াছ, বুঝিয়াছ, পাইয়াছ, এখন আর দেহের প্রতি এত লালসা কেন?

মনকে দেহাতীত কর। একার চেষ্টায় ইহা হইবে না, তোমাদের দুজনকেই এজন্য কাজে লাগিতে হইবে। তোমার আরও এক দেড় হাজার গুরুভগিনী স্বামীর সহিত ভাইবোনের মত পবিত্রভাবে বাস করিতেছে, তোমরা দুজনেই বা তাহা করিতে অক্ষম হইবে কেন? পুনরপি আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ গুরুধাম

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭৫

(৩০-৪-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের একই শহর হইতে প্রায় ছয় সাতখানা পত্র পাইলাম। প্রত্যেকের পত্রের উত্তর এক পত্রেই দিতেছি। এখন আমি অধিক শ্রম করিতে পারিতেছি না। তবু এত পত্র ও দর্শনার্থী আসিতেছে যে, সামাল দেওয়া কঠিন। পাঁচ জন বিজ্ঞ চিকিৎসক বাড়ীর দরজায় নোটিশ দিয়া রাখিয়াছেন, দর্শনার্থীদের প্রবেশ

নিষেধ কিন্তু জোর করিয়া তাহা অমান্য করিয়া প্রত্যহই দুই চারিজন লোক খুব অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। মাণিকতলায় ছায়া-সিনেমার দালানে ভাড়াটে ঘরে বারোটা বৎসর প্রতপ্ত গ্রীষ্মে দগ্ধ হইবার পরে নূতন বাড়ীতে আসিয়াও দেখিতেছি যে, তোমাদের ভক্তির আতিশয্য সহনাতীত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও আমার শরীর দূরদেশ ভ্রমণের যোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, এককণা রৌদ্রও শরীরে লাগান চলিবে না। তাই অন্যত্র যাইতে পারিতেছি না। তাঁহারা আরও চারি সপ্তাহ পর্য্যবেক্ষণে রাখিবেন।

যাহা হউক, সকলের সকল প্রশ্নের জবাব একখানা পত্রেই দিতেছি।

তোমাদের অনেকেরই মধ্যে একটা দারুণ দুর্ব্বলতা দেখিতেছি যে, তোমরা নূতন বাড়ী করিবে বা পুরাতন বাড়ীতে নূতন ঘর বা দালান তুলিবে, আমাকে দিয়াই গৃহপ্রবেশ করান চাই। সমবেত উপাসনা করিয়া যার যার গৃহ-প্রবেশ সারিলে কি চলে না? সমবেত উপাসনার আসরে আমার জন্য কি একখানা আসন থাকে না? আমি যে সমবেত উপাসনাতে তোমাদের সঙ্গে সমসাধক রূপে নিজ আসনে থাকি, এই কথাটী কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? গুরুবাক্যই যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমাকে গুরু মানিয়া দীক্ষাটী নিয়াছিলে কেন?

আমার নিজের হাজার রকমের কাজ আছে, অনেক সময়ে

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিয়া ভ্রমণ আছে, মানুষের শরীর বলিয়া তাহার প্রতিও কিছু কর্ত্তব্য আছে (যাহা পালন করিতে আমি বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে ফুরসুৎ পাই নাই) এবং এখন শরীর প্রবীণ বলিয়া হঠকারিতা করিয়া শ্রম অতিরিক্ত বাড়ানও সঙ্গত নহে। এসব কথা কি তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই?

সংসারীর গৃহ স্বার্থেরই গেহ। আমি তোমাদিগকে জগৎ-কল্যাণের সাধন দিলেও এখনও তোমরা নিজেদিগকে সম্যক্ রূপে জগৎকল্যাণব্রতী করিয়া তোল নাই। আজও তোমাদের গৃহগুলি জগৎকল্যাণের এক একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। এমতাবস্থায় আমাকে জোর-জবরদস্তি করিয়া তোমাদের প্রতিজনের নবগৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠানে টানিয়া নিবার ভিতরে সামূহিক সার্থকতা কি আছে?

একজন গরীবের গৃহপ্রবেশে গেলাম না কিনতু একজন ধনীর গৃহপ্রবেশে গিয়া হাজির হইলাম। বল, ইহা দ্বারা মানুষের মনে ভ্রান্ত সমালোচনার উদ্দৃক্তি ঘটাইবার হেতু হইব না কি? একজন সামর্থ্যবান্ ব্যক্তির গৃহপ্রবেশে গেলাম না কিন্তু ধর, একজন অসমর্থ ব্যক্তির গৃহপ্রবেশে গিয়া হাজির হইলাম। আমি কোথাও গেলে বিনা নিমন্ত্রণেও দুই এক শত আগন্তুক আসিয়া হাজির হইলেন। হুজুগ জমিয়া গেলে তাঁহাদের সংখ্যা হাজারও হইতে পারে। লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে তাহাকে আটকাইবে কে? কিন্তু গরীব গৃহস্থ আতিথ্য দিতে পারিল না। দিতে চেষ্টা করিয়াও

বাজারে পাঁচশ টাকা দেনা হইয়া গেল। আর পরে মাসে মাসে কৃচ্ছ্রসাধন, বৎসরে বৎসরে দুঃখবরণ এবং সুদীর্ঘকাল পরে অতীব ক্লেশে দায়মোচন। বল, ইহা কি একটা অভিলষণীয় অবস্থা?

তুমি ছোট হও, বড় হও, তোমার নবগৃহপ্রবেশ তোমার পক্ষে বড় দামী অনুষ্ঠান। সুতরাং আমাকে তুমি তাহাতে চাহিবে, ইহা দোষেরও নহে কিম্বা অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি ঐ ঘরে প্রবেশ করিবে না, বাহিরের দর্ম্মার তৈরী বাচারীর নীচে মাসের পর মাস বছরের পর বছর রৌদ্রে পুড়িবে, বর্ষায় ভিজিবে, শীতে কাঁপিবে, শিশিরে কাসিবে, এই জেদ্ কোনও কাজের কথা নহে। দীক্ষার দিনই ত' বলিয়া দিয়াছি, আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি। প্রত্যেকটী সমবেত উপাসনাতে আমি তোমাদের পুরোভাগে থাকি। গুরুবাক্যকে বেদবাক্য জানিয়া তাহাতে বিশ্বাস নিয়া নির্ভয়ে গৃহপ্রবেশ কর। আমার জড় শরীরটাকে অনুচিত ক্লেশ দিয়া হইলেও তাহাকেই টানিয়া আনিতে হইবেই কেন? তোমরা বিবেচক হও। জিদ্ গোঁড়ামি, অতিভক্তি কোনও কাজে আসে না।

কয়েক বছর আগে ডিব্রুগড়ের শ্রীমতী খুকুরাণী চৌধুরী আসিয়াছিল বীরভূমের আমেদপুরে ভ্রাতার বাসায়। জন্মোৎসব করিতে গিয়া দেখিল, সমবেত উপাসনায় লোক নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, "যত দিন বাবামণি এখানে আসিয়া সমবেত উপাসনার লোক সৃষ্টি না করিবেন। ততদিন এই স্থান ত্যাগ করিব না।"

বছরের পর বছর সে প্রতীক্ষা করিল। তাহার ভ্রাতা ভাল চাকুরী পাইয়া চলিয়া গেল বোম্বে না ট্রম্বেতে। কিন্তু খুকুরাণী গেল না, সে পড়িয়াই রহিল। আমাকে কয়েক বৎসর পরে বাধ্য হইয়া আমেদপুর যাইতে হইল। খুকুরাণী যাহা চাহিয়াছিল, তাহা হইল, তবে সে ত্রিপুরার চড়িলামে নিজের দেশে ফিরিল।

তাহার আবদার একটা ব্যক্তিবিশেষের গৃহে প্রবেশের আবদার নয়, একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের আবদার। সে নিজের ব্যক্তিটাকে বলি দিয়া সমগ্র দেশ ও সমাজটার কথা ভাবিয়া শবরীর এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাটী করিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্তের সহিত তোমাদের আবদারগুলির গুণগত ও ফলগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

আর একটী প্রশ্ন তোমাদের কীর্ত্তন সম্পর্কে। প্রশ্নের জবাব দিবার আগে কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যটুকু বলিয়া নেই। কীর্ত্তনের প্রথম উদ্দেশ্য নিজের বহির্ম্মুখ মনকে বাহিরের দশটী বিশটী বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া অন্তর্মুখ করা, যেন ইহার ফলে এমন ধ্যানাবেশ আসিয়া যায়, যেই ধ্যানাবেশের সুযোগে তোমার মনটী নামের সেবায় একাগ্র নিষ্ঠায় ডুবিয়া যাইতে পারে। কীর্ত্তনের ইহাই যদি সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য না হইত, তাহা হইলে নানা দিগ্‌দেশে কীর্ত্তনের এত কৌলীন্য হইত না, এত সমাদর ঘটিত না। কীর্ত্তনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অপরের বহির্ম্মুখ মনকে নামরসের আস্বাদনে উন্মুখ ও আকৃষ্ট করা।

ফলে, কীর্ত্তনকালে তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অকারণ

কণ্ঠের বিকৃতি, অপরের মনে ভীতিসঞ্চারক দারুণ আওয়াজ, অন্যের কণ্ঠের সহিত অমিল-সংগঠক বেতাল চাল, এসব বর্জ্জন করিতে হইবে। যাহার কণ্ঠ সুমিষ্ট, যাহার তাল নির্ভুল, যাহাকে পুরোভাগে পাইলে অপর সকলের ভিতরে সহজে প্রচুর আনন্দ, তাহাকেই কীর্ত্তনকালে মূল গায়েন রাখা সঙ্গত। সম্প্রতি অনেক স্থানে তোমাদের ভিতরে এক অদ্ভুত দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে যে, তোমাদের পুত্র বা কন্যাটীর কীর্ত্তন কেহ পছন্দ করে না বা মূল গায়েন রূপে কীর্ত্তন পরিচালনের দক্ষতাও তাহার নাই তবু অন্যের অপ্রীতির দিকে না তাকাইয়া নিজ পুত্র বা কন্যাটীকে বা নিজের প্রীতি-পাত্রী অন্য একটী আনাড়ী গায়ক বা গায়িকাকে কীর্ত্তন পরিচালনের জন্য জোর করিয়া বসাইয়া দিলে। এই সব হইতে তোমরা বিরত থাকিও।

কীর্ত্তন সম্পর্কে আরও একটী বিষয় বিবেচ্য আছে। কীর্ত্তন-পরিচালক কীর্ত্তনের নাম করিয়া এমন কতকগুলি বিষয়ের বা প্রসঙ্গের অবতারণা করিল যে, কীর্ত্তনটী সকলের সঙ্ঘবদ্ধ অনুশীলনের জিনিষ না হইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। যেখানে সমাগত লোকেরা অনেকেই নিজ নিজ কণ্ঠ দ্বারা হরিওঁ নামকীর্ত্তন করিবার আগ্রহ লইয়া আসিয়াছেন, সেখানে এই জাতীয় কার্য্যক্রম অনুসরণ করা তোমাদের পক্ষে ভুল হইবে। অনেকে কীর্ত্তন করিতে আনন্দ পান এবং অন্য সুদক্ষলোকদের কণ্ঠের সহিত নিজ কণ্ঠের মিল রাখিবার চেষ্টা

করিতে করিতে কালক্রমে ভাল কীর্ত্তনকারী হইয়া থাকেন। সুতরাং কীর্ত্তনের আসরে যাঁহারা যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ কণ্ঠকে নিয়োজিত করিবার সুযোগটুকু দেওয়া সঙ্গত।

কীর্ত্তনকালে নানাবিষয়ে কথোপকথন, পরনিন্দা, অন্য সংঘের লোকদের নিন্দাবাদ, হাঁপানো, অবিরাম কাসিতে থাকা, অধোবায়ু ত্যাগ, বিড়ি, পান, সিগারেট, চা, কফি প্রভৃতি সেবন নিতান্ত গর্হিত। এগুলির কিছু কিছু মধ্য যুগের চণ্ডীমণ্ডপের আসরে গ্রামবৃদ্ধেরা হয়ত দয়াপরবশ হইয়া সহ্য করিতেন কিন্তু এখন এগুলি সহনাতীত। কীর্ত্তনের আসর হরিনাম-কীর্ত্তনেরই আসর। অন্য কাজ এখানে করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

কীর্ত্তনারম্ভে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ এবং কীর্ত্তনান্তে অঞ্জলি দান বিধেয়। ফুল-বেলপাতা-ধান্য-দূর্ব্বা, তুলসী-চন্দন আদি না জোগাড় হইলে শুধু কৃতাঞ্জলিপুটেই অঞ্জলির মন্ত্রপাঠ করিয়া বিগ্রহ প্রণাম করা যায়।

কেহ কেহ অখণ্ড-সংহিতা পাঠকালে ব্যাখ্যা করেন। কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে ব্যাখ্যা চলে, এমন ক্ষেত্রও আছে, যেখানে ব্যাখ্যা চলে না। কীর্ত্তন-সঙ্কল্প নিয়া বা উপাসনা-সঙ্কল্প নিয়া প্রারম্ভিক অখণ্ড-সংহিতা পাঠ হইতেছে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকার যতই পণ্ডিত হউন, তাঁহার চেষ্টা অবৈধ। কিন্তু শুধু অখণ্ড-সংহিতা পাঠের জন্যই পাঠ চলিতেছে, প্রারম্ভে "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" করিয়াই আরম্ভ করিয়াছ এবং উপসংহারে হয়ত হরিওঁ কীর্ত্তনই

করিবে, এমত স্থলে যোগ্য ব্যাখ্যাতা থাকিলে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই চলিবে। বাগুইআটির (দেশবন্ধুনগর) শ্রীমান্ নিত্যানন্দ দত্ত নূতন বাড়ী করিয়া এমন একজন কথক ঠাকুরকে দিয়া কয়েকদিন অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করাইয়াছিল, যিনি ভাগবতে সুপণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ সুপাঠক। তিনি অখণ্ড-সংহিতা পাঠকালে নানা টীকা, টিপ্পনী, দৃষ্টান্ত, উপাখ্যান, সঙ্গীত আদি দ্বারা পাঠকার্য্যকে এমন চিত্তাকর্ষক করিয়াছিলেন যে, ইহা চতুর্দ্দিকের লোকের অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। বলাই বাহুল্য, অখণ্ড-সংহিতার ব্যাখ্যা করাই এখানে উদ্দেশ্য, আনুষ্ঠানিক পাঠ ইহা নহে। কিন্তু সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে, নগর-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে বা উদয়াস্ত কীর্ত্তন, উদয়াস্ত জপযজ্ঞ, উদয়াস্ত গায়ত্রীগান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের প্রারম্ভে সূচনা রূপে যে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ হইবে, তাহাতে ধীর, সুস্পষ্ট, উদাত্ত কণ্ঠে নির্ব্বাচিত অংশের পাঠই মাত্র হইবে, এ সময়ে কেহ ব্যাখ্যা বা গীতিসংযোগ আদি করিতে অধিকারী নহে।

অনেক স্থানে তোমরা সমবেত উপাসনা আদি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের প্রথমে "খণ্ড আজিকে হোক অখণ্ড" বা "যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে" গাহিয়া থাক। ইহা গাহিও না। "খণ্ড আজিকে" গাহিবার সময়ে সকলের দাঁড়াইতে হয়। সমবেত উপাসনা আরম্ভের কালে আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার বিধি নাই। সভা-সমিতি আরম্ভের কালে যে অখণ্ড-সঙ্গীত সুগেয়, তাহাকে

আনিয়া তোমরা সমবেত উপাসনার, উদয়াস্ত নামকীর্ত্তনের, উদয়াস্ত জপযজ্ঞের, উদয়াস্ত গায়ত্রীগানের, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের অঙ্গীভূত করিও না। জনে জনে স্থানে স্থানে নূতন নূতন জিনিষ প্রবর্ত্তনের ফলে শেষে তাল-গোল পাকাইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার হইয়া যাইবে। তোমাদের কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত জেদের ফলে এগুলি হইতেছে। জেদ তোমরা পরিহার কর, ব্যক্তিত্বকে এসময়ে বলি দাও।

কোথাও কোথাও তোমরা সমবেত উপাসনার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উপাসনার ক্রমগুলির ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়া যাও। ইহা উচিত নহে। লোককে সমবেত উপাসনার বিষয় বুঝাইবার জন্য তোমরা আলাদা ক্লাস করিতে পার। সমবেত উপাসনার কালে কেহ কেহ আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া থাক, "এই আমরা এখন জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প সুরু করিলাম",—"এই আমরা এখন অমুকের দীর্ঘায়ু কামনায় জপ-কার্য্য সুরু করিতেছি," এইরূপ কাজ গর্হিত। সমবেত উপাসনার সময়ে একমাত্র উপাসনার প্রকাশ্যে উচ্চার্য্য মন্ত্রধ্বনি ছাড়া অন্য কোনও ধ্বনি তোমাদের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইবে না এবং অপর কাহারও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত অন্য কোনও ধ্বনি তোমাদের শুনিবার নহে।

কখনো কখনো কাহারও বিশেষ কোনও কুশল প্রার্থনা করিয়া সমবেত উপাসনা হইয়া থাকে। সেই সময়ে একটী বোর্ডে উপাসনার উপস্থিত উদ্দেশ্যটুকু লিখিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। চীৎকার

করিয়া তাহা সকলকে শুনাইবার প্রয়োজন নাই। সমবেত উপাসনাকালে সবগুলি ব্যষ্টি মিলিয়া একটী সুমহতী সমষ্টিতে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একজনে উপাসনার উপস্থিত উদ্দেশ্যটী জানিলেই সকলের জানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা উচিত।

তোমাদের মধ্য হইতে আরও একটি সংবাদ মাঝে মাঝে পাইয়া বড়ই আমোদ অনুভব করি। তোমার ছেলেটি খেলা করিতে করিতে ঘাটপাড়ে একটি শিবঠাকুর পাইয়াছে, এখন সেই ঠাকুরকে পূজার ঘরে বসাইয়া ধূমধাম সহকারে পূজার্চ্চনা হইতেছে। মেয়েটি রেলরাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে একটী নারায়ণ-শিলা পাইয়াছে এবং পাড়ার সব লোক নিয়া সেই শিলার পূজায় ব্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও সেই পূজা সুরু করিয়া দিয়াছ এবং এখন একথা ভাবিয়া ফাঁপড়ে পড়িয়াছ যে, এই নূতন দেবতাকে লইয়া কি করিবে।

দেখ, আমি প্রতিমাধ্বংসকারী Iconoclast নহি। আমি প্রতীকের সার্থকতায় বিশ্বাস করি। আমি জানি, জগতের প্রত্যেক ধূলিকণাতে পরমেশ্বর আছেন। কিন্তু কথা হইল এই যে, হাওড়া হইতে বোম্বে পর্য্যন্ত, পাঠানকোট হইতে রামেশ্বরম্ পর্য্যন্ত, দেরাদূন হইতে ত্রিভান্দ্রাম পর্য্যন্ত, পুরী হইতে আহামদাবাদ পর্য্যন্ত, চাঁদপুর হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত, চট্টগ্রাম হইতে পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত, কাটিহার হইতে লিডু পর্য্যন্ত রেল-রাস্তার সকল পার্শ্বে যত শিলা

আছে, সব পাথরই ত' মহাদেব, সব পাথরই ত' নারায়ণ-শিলা। এগুলির মধ্যে এমন একটাও নাই, যাহা তিনি নহেন, যাহাতে তিনি নাই। এখন তুমি কি সব শিলা নিয়া তোমার ঠাকুরঘরে তুলিবে? একই বহু হইয়া বিশ্বতোবিকাশ লাভ করিয়াছেন কিন্তু তুমি এককেই পূজা করিবে বহুকে নহে। তোমার পক্ষে এই উপদেশের অর্থ সুস্পষ্ট। সুতরাং শিশুদিগকে বুঝাইয়া একের পথে টানিয়া আনা উচিত, তাহাদের সহিত হুজুগে মাতিয়া নিজেরাও কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার,১৩৭৫
(৩০-৪-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দশ মিনিটও হয় নাই, কাছাড়-নিবাসী তোমার এক গুরু-ভ্রাতাকে লিখিয়াছি,—"সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দাও যে, ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যও যদি কেহ পালন করে, তবে তাহা দ্বারা তাহার কর্ম্মশক্তি, চিন্তাশক্তি, প্রচারশক্তি, প্রভাবশক্তি এবং অধ্যাত্মশক্তি প্রবর্দ্ধিত হইবে। যে স্বল্প সময়ের

জন্যও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতকে শক্ত মুঠিতে ধরিতে পারিয়াছে, সে অনায়াসে আমার কাজে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।" তাহাকে লিখিয়াছি,—"শুধু চিরাচরিত ভাবে প্রচার ও সংগঠন না করিয়া তোমরা নিজেরা যে যতটুকু পার, ব্রহ্মচর্য্য-ভিত্তিক হইয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ কর।"

ব্রহ্মচর্য্য জীবনের বনিয়াদ। ব্রহ্মচর্য্যে যে যত সুপ্রতিষ্ঠিত, তার জীবন-কর্ম্ম তত দৃঢ়, ব্যাপক ও সুদৃঢ়কালপ্রসারী হইবে। চারিদিকের চঞ্চল দুনিয়ার নানা অদল-বদলের লীলাখেলা দেখিয়া তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যে বিশ্বাস কর এবং প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপন-কালে ব্রহ্মচর্য্যকেও যে যতটুকু পার, পালন কর। এমন ত' নহে যে, জগতে কেহই ব্রহ্মচর্য্য পালে নাই! এমন ত' নহে যে, তোমার মতন অনেক সাধারণ গৃহী সামান্য চেষ্টার পরে জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের মধুরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন ত' নহে যে, ব্রহ্মচর্য্য একটা মঙ্গলগ্রহের জীব-বিশেষ, যাইহাকে আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখে নাই, যাহার নাম কেহ শোনে নাই। ব্রহ্মচর্য্য বহুজনের পরিসেবিত প্রত্যক্ষ আস্বাদনক্ষম এক চমৎকার জীবন-চর্য্যা, যাহার ফল চিত্তপ্রশান্তি, অভয় এবং শক্তি। ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া তোমরা জীবন গড়িতেছ, তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে অবহেলা করিতে পার না।

অল্পই পালন করিতে পারিয়াছ, তাহাতে ক্ষতি নাই। অল্প ফলটুকুও তুমি পাইবে। বেশী পালন করিলে বেশী ফল পাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যের ফল প্রত্যক্ষ। নিতান্তই যে কামের কুক্কুর, তাহাকে গিয়া বুঝাইয়া বল, সে মাসে দুই দশটা দিনও সংযত হইয়া চলুক, ফল সে সঙ্গে সঙ্গে পাইবে। এক সপ্তাহ, এক দিন, একটী মুহূর্ত্তও যে ব্যক্তি মনে প্রাণে ব্রহ্মচারী হইয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে নবশক্তির আস্বাদন লাভ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য এক অব্যর্থ বহ্নি, স্পর্শমাত্র তাহার উত্তাপ অনুভূত হয়।

তোমার ত্রিপুরা-নিবাসী অপর এক সতীর্থকে আজ যাহা লিখিলাম, তাহার অনুলিপি পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে পাঠ কর।

ছাত্রদের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ কর। তাহাদের প্রতিজনকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও রুচিমান্ করিয়া তোল। তাহাদিগকে সত্য, সদাচার সন্নীতি, সদ্ভাব ও সজ্জীবনের প্রতি আকৃষ্ট কর। চারিদিকে চিত্তবিভ্রান্তিবর্দ্ধক নানা আন্দোলন থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে এই দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাও। চেষ্টা করিলেই দেখিবে, তাহাদের রোখ্-বদল হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে যত অপদার্থ তোমরা মনে করিয়া থাক, তাহারা তত অপদার্থ নহে। আসল কথা এই যে, সরল হৃদয়, স্বচ্ছ মন, প্রেমপূর্ণ প্রাণ ও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধি লইয়া তাহাদের মধ্যে অতি অল্প জনই যাইতেছে। 'আমি আমার দল বাড়াইব'—এই বুদ্ধি লইয়া যদি ইহাদের মধ্যে কেহ যায়, তবে তাহার শ্রম সম্পূর্ণ সফল হইবে কেন? দল বাড়াইবার জন্য ইহাদের মধ্যে ত' কত শত শত লোক কাজ করিয়া যাইতেছে। কাহারও লক্ষ্য রাজনৈতিক, কাহারও

লক্ষ্য অবতার-বিশেষের উপাসকের সংখ্যাবৃদ্ধি। তোমরা দলবুদ্ধি লইয়া ইহাদের মধ্যে যাইও না। ইহাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটুক, ইহাদের শক্তি, সামর্থ্য, সাধনা তাহাদের চরম উন্নতির অভিমুখী হইয়া জগতের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ-সাধনে প্রযুক্ত হউক, অন্ধের ন্যায় অন্যের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ইহারা নিজ নিজ চোখে পৃথিবী দেখিয়া নিজেদের বিবেক দিয়া পরিস্থিতি বিচার করিয়া নিজ বাহুবলে বিশ্বময় জয়গৌরব অর্জ্জন করুক, নিজ প্রতাপে সর্ব্বত্র আত্ম-বিস্তার সাধন করুক। ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট কর। তাহার ফল সমগ্র দেশ, জাতি ও জগৎ পাইবে। যে সময়ে চতুর্দ্দিকে শুধু কলরব উঠিতেছে—'ভোগকে কর নিরঙ্কুশ', সেই সময়ে আমি বলিয়া বেড়াইতেছি,—'মানুষকে কর আত্মসংযমসমর্থ দেবতা, মানুষের ভিতরের পশুটা দ্রুত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হউক।' আমি চাহি মানবত্বের দেবত্বে উন্নয়ন।

পশুর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির মানে পশুর মৃত্যু নয়, পশুর পশুত্বমোচন, পশুর মানবত্ব লাভ, মানবত্বের দেবত্বে উন্নয়ন। যতক্ষণ আত্মসুখে রতি, ততক্ষণ তুমি পশু। নিজের সুখের ব্যাঘাত না ঘটিলে যখন তুমি পরসুখে আগ্রহী, তখন তুমি মানুষ। নিজসুখে বিসর্জ্জন দিয়াও যখন বিশ্বজনের সুখ তোমার কাম্য, তখন তুমি দেবতা।

লক্ষ্যকে স্পষ্ট রাখিয়া কাজ কর। অন্তরের আবেগ নিয়া যখন কাজ করিবে, তখন দেখিবে, বাধার প্রাচীর চূর্ণ হইয়া যাইবে, সব অসম্ভব সম্ভব হইবে, যাহা চাহিবে, তাহাই ঘটাইতে

পারিবে। সত্যিকারের স্থায়ী আবেগ ব্রহ্মচর্য্য-কল্প-পাদপের ফল। পাথর-কাঁকরেও গাছ হয়, তবে চেষ্টা করিতে হয়, যত্ন নিতে হয়, জলসিঞ্চন করিতে হয়, ভাল করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া শিকড়ের খাদ্য উৎকৃষ্ট সার প্রচুর পরিমাণে দিতে হয়। যাহা করিলে সফলতা, তাহা করিব না অথচ সফলতার আশা করিব, ইহা বেহিসাবী বুদ্ধির কাজ।

কাজ সুরু করা উত্তম কথা। কারণ, সুরু না করিলে কখনো কাজ শেষ হয় না। যত বড় কাজই হউক, সুরু করা চাই। সুরু করিলে, একদিন কাজ শেষ হইবেই। কিন্তু সুরু করা যেমন বড় কথা, কাজ চালু রাখাও তেমন বড় কথা। সুরু করিলাম কিন্তু কাজ চালু রাখিলাম না, ছাড়িয়া দিলাম, একাজ শেষ হইবে কেমন করিয়া? দ্রুত চালাইতে না পার, ধীরে ধীরে চালাও, তবু রথ চালু থাকুক, এইটী ভুলিও না।

বৈষয়িক লিপ্ততা বা সাংসারিক দায়িত্ব বশতঃ সমাজের প্রতি করণীয় যে কাজগুলি নিজে করিতে পার না, তাহা করিবার জন্য অন্যের মনে তুমি প্রেরণা-সঞ্চার করিতে পার। মহাযুদ্ধ লাগিলে সবাই কি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া কামান-বন্দুক ছোঁড়ে? অন্য লোকেরা তাহাদিগকে সাহায্য করে, সহায়তা দেয়, প্রেরণা যোগায়, উৎসাহিত করে। অন্য কাজ না পার, সেই কাজটাই তোমরা কর। নিজে কাজে নামিয়া যাওয়া যেমন মহত্ত্ব, অপরকে কাজে নামিতে নিরন্তর উৎসাহিত করাও তেমন মহত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ নিজে যুদ্ধ করেন

নাই কিন্তু যুদ্ধের বাঁশী বাজাইয়াছিলেন,—“ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। হে অর্জ্জুন, ক্লীবতার আশ্রয় নিও না, ক্লীবতা তোমাতে সাজে না।” ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৫
১-৫-৬৮ ইং

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। * * * এক সময়ে এদেশে দেহতত্ত্বের গানের বড়ই প্রচলন ছিল। গুরুদেবেরা শিষ্যকে সাধন-ভজন করিবার ব্যাপারে যেই সকল গূঢ় উপদেশ দিতেন, তাহাই যাহাতে নানা ভাবে শিষ্যের মনে বারংবার জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সাধন-বিষয়ে উদ্যত রাখে, তাহার জন্যই এসব গান প্রচলিত হইয়াছিল। সঙ্গীতের সুরের, তালের এবং অঙ্গভঙ্গীর যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। এই জন্য এক যুগে সাধন-তত্ত্ব সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারিত হইত। কিন্তু সকল গুরুর সাধন-মার্গ এক নহে, অথচ অনেকেই নিজ নিজ সাধন-মার্গের কথাই সঙ্গীতে বলিয়াছেন। এজন্য এক গানের সঙ্গে অন্য গানের তত্ত্বতঃ অনেক বৈষম্যও পরিলক্ষিত হইত। এক সাধন-পথের পথিকেরা ভ্রূমধ্যে

মনঃসন্নিবেশন করাকে আবশ্যক মনে করিতেন। গান বাঁধিলেন, —চলরে মন ত্রিবেণীর ঘাটে। অন্য পথের পথিকেরা নারী-পুরুষের রজোবীর্য্যের মিলন-সাধনকে আবশ্যক জ্ঞান করিতেন। তাহারা আবার হেঁয়ালীর ভাষায় আর একটী গান বাঁধিলেন। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা ও দরবেশদের সেই সেই গান তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে দেহতত্ত্বের গান রূপে বিশেষ সমাদৃত হইত। সকলেরই সাধন-মার্গ সমান নৈতিক শুচিতার বা সমান দৈহিক শুদ্ধির দাবী করিত না। এজন্য এক এক মার্গের দেহতত্ত্বের গান অন্য অন্য মার্গের দেহতত্ত্বের গান হইতে আলাদা ধরণের হইত। কোনও কোনও গানে হয়ত একটী মাত্র পদের মধ্যে সাধনের সঙ্কেতটী বা ধ্যানাবেশের ইঙ্গিতটী বলা হইত কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দকে ধরিয়া কবিত্ব করিতে করিতে গানের রচয়িতা তাঁহার আসল বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়াও যে যাইতেন না, তাহা নহে। ভাবের কবি যখনি শব্দের কবি হইবেন, তখনি তাঁহার শব্দ, ঝঙ্কার তাঁহাকে তাঁহার ধ্যানের আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া পঙ্কে যে অবগাহন করাইয়া দিবে না, তাহার স্থিরতা কি? সুরতাং বাউল-বৈষ্ণবদের দেহতত্ত্বের গান শুনিয়া তাহার প্রত্যেকটা অক্ষরই তোমাকে বুঝিয়াই নিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই।

আমি এমন অনেক দেহতত্ত্বের গান শুনিয়াছি, যাহাকে সরল অর্থে বুঝিতে গেলে অতীব বিকট এবং কদর্য্য ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া নিতে হয়। কিন্তু এক একটী শব্দকে তাহার প্রচলিত অর্থ

হইতে বিযুক্ত করিয়া সুদূরার্থে ব্যাখ্যা করিলে স্পষ্ট মনে হয় যে, জীব ও ব্রহ্মের মিলন-কথাই এখানে বলা হইতেছে এবং ইহাতে দেহের নানা অঙ্গের, নানা চক্রের, নানাবিধ বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে দেহ-ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই।

অনেক দেহতত্ত্বের গান তান্ত্রিকের ষট্‌চক্রের রহস্য নিয়া রচিত। আমি ত' তোমাদের বলিয়াই দিয়াছি যে, আমাদের জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণই দেহ-তত্ত্বের ব্যাপারে চূড়ান্ত, কারণ তাহা দেহকে বিশ্বমঙ্গলকারী করিয়া গড়িয়া তোলে, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাহাতে নাই। সুতরাং তোমরা গ্রাম্য বৈষ্ণবদের দেহতত্ত্বের গান শুনিয়া আফশোষ করিও না,—'হায়, কিছুই শিখিলাম না'।

শুদ্ধাচারীর বৈষ্ণবদের মধ্যে গিয়া দেখ, তাঁহারা একমাত্র নাম-সম্বল করিয়া পরমাভীষ্টে ভক্তি অর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করিবার জন্য, জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য বা শিখিবার জন্য একেবারেই ব্যগ্র নহেন।

আবার অশুদ্ধাচারী বৈষ্ণবেরা কোথাও কোথাও কেহ কেহ আলোছায়াময় হেঁয়ালী-ভাষায় রচিত এই সকল দেহতত্ত্বের গানের পদকে বেদবাক্য মনে করিয়া জিজ্ঞাসু ও অদ্যাত্মরস-পিপাসু সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগকে অতীব গর্হিত, আপত্তিজনক ও শক্তিক্ষয়কর কুকার্য্যেও নিরত করিয়া দিতেছে।

ঠকিয়া শিখার চাইতে দেখিয়া শিখা অনেক ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৮ই বৈশাখ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তুমি যে চিত্রটী আঁকিয়াছ, তাহা হতাশার এক বিষাদমাখান আলেখ্য, যাহা কর্ম্মোদ্যমহীন দুর্ব্বলে সাজে, আশাবাদী উদ্যমপরায়ণ কর্ম্মীতে শোভে না।

দুর্ব্বলতা পরিহার কর।

হতাশা দুর্ব্বলতার শুধু লক্ষণই নহে, ইহা দুর্ব্বলতার প্রসূতিও বটে। এই জন্যই হতাশা পরিত্যাগ প্রয়োজন।

তোমার মনের হতাশা বিদূরণে যে তোমাকে সহায়তা দিবে, জানিও, সে তোমার পরম বান্ধব। বান্ধবদের খুঁজিয়া বাহির কর। যাহাদের সংসর্গ হতাশাবর্দ্ধক, তাহাদের ছায়াও মাড়াইও না।

গুরুতর বিপত্তির মধ্যেও স্থির থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য-পথে চলিতে হইবে। সেই চেষ্টাই কর। সেই চেষ্টায় নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে সুপ্ত সাহস জাগিয়া উঠিয়া উৎসাহ আসিবে, চারিদিক হইতে অভাবনীয় সহায়তাও মিলিবে। বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাসীর পরাজয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫

(২-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেখানে মাত্র দুইজন গুরুভ্রাতার খোঁজ পাইবে, সেইখানেই একটী নূতন অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিবে এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসদা চালু করিবে। অনেক গুরু-ভাই না হইলে মণ্ডলী হইবে না, সমবেত উপাসনা চলিবে না, এই জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা কদাচ পোষণ করিবে না। সমবেত উপাসনা দুজনে মিলিয়াই সুরু কর, আর তিন জনেই কর,

(১) যদি ভক্তিযুক্ত চিত্তে উপাসনায় বস,

(২) যদি প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে বসিয়া যাও,

(৩) যদি উপাসনার আসরকে গল্পের বা গুলতানির আসরে পরিণত না কর,

(৪) যদি সৎলোকদিগকে উপাসনায় যোগ দিতে অকপট আগ্রহে আহ্বান জানাও,

(৫) যদি মান্য ব্যক্তির সম্মানে আঘাত না কর,

(৬) যদি গরীব বলিয়া কাহাকেও তুচ্ছ না কর,

(৭) যদি ঝগড়া, কলহ, দলাদলি না কর,

তবে দেখিবে, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই তোমাদের উপাসনার আসর জমজমাট হইয়া গিয়াছে, মণ্ডলীর অঙ্গন ভক্তিমান, সাত্ত্বিক ও সর্ব্বজনমঙ্গলকামী উপাসক-উপাসিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, মণ্ডলী হইল কি কলহ সুরু হইয়া গেল। কিন্তু ইহা অহমিকার ফল, ঔদ্ধত্যের ফল, নিজেকে বড় ভাবিয়া অন্যকে ছোট জ্ঞান করিবার ফল। আমাদের সমবেত উপাসনার লক্ষ্য সকলের মধ্য হইতে উচ্চনীচের ভেদ-জ্ঞান দূর করিয়া দেওয়া, সকল পরকে আপন করা। বিনম্র মন, সহৃদয় সহযোগ, অকপট প্রেম ও নিরহঙ্কার আচরণ ইহার প্রকৃত উপায়। তোমরা বিনয়-ভ্রষ্ট হইও না।

অপরে শ্রম করিবে কিন্তু নিজে যশটুকু নিব, এই চতুরতাও তোমাদের থাকিলে চলিবে না। অপরের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, সম্পত্তি ও তৈজসপত্র অপহরণই চুরি নহে, অপরের প্রাপ্য যশ নিজে নেওয়াও চুরি। এই চুরির লোভ যদি দূর করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, হাজার কর্ম্মী আসিয়া নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যানুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছে, কাহারও বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অভিযোগ নাই।

মণ্ডলী গড় এবং মণ্ডলীর চারিদিকে সাত্ত্বিক আবহাওয়ার সৃষ্টি কর। সাত্ত্বিকতার জন্ম ত্যাগে, দাবীতে নহে। দাবীর জন্ম রাজসিকতায়, ইহা সংগ্রামের সহধর্ম্মিণী। নামযশের দাবী ত্যাগ কর, নেতৃত্বের দাবী ত্যাগ কর, সকলের নিকট সম্মান পাইবার

দাবী ত্যাগ কর, দেখিবে অপরূপ সাত্ত্বিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং নামযশ, নেতৃত্ব, মান-সম্মান প্রয়োজন সময়ে আপনা আপনি আসিয়া যাইবে।

আমি জীবনের ষষ্টিবর্ষকাল অকপটে জনসেবা করিয়াছি। তাহার ফলে আমার প্রতি অনুরক্ত লক্ষ লক্ষ লোককে বুকের মাঝে পাইয়াছি। ইহারা কত জন যে কত স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বলা ভার। তোমরা ইহাদের খুঁজিয়া বাহির কর। অনেকে বর্ণচোরা আমের মত নিজেদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। লুকাইয়া থাকিবার হয়ত কারণও কিছু আছে। কিন্তু তোমরা বিশ্বজনের কুশলকর্ম্মে ইহাদের সকলকে খুঁজিয়া বাহির কর এবং কাজে লাগাও। কাজে লাগিবার প্রথম সর্ত্ত ঐক্য আর ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় সমবেত উপাসনা।

আমি যে সকল নরনারীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরিধির মধ্যে গিয়া কখনো পড়ি নাই, এমনও লক্ষ লক্ষ নরনারী দিকে দিকে আমারই চিন্তা, আমারই ধ্যানগুলির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে গোপন-পদ-সঞ্চারে আমার কুটীর-দুয়ারের দিকে অভিসার সুরু করিয়াছে। তোমরা সামান্য চেষ্টা দ্বারা তাহাদিগকেও আবিষ্কার করিয়া লইতে পার। তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর এবং সমবেত উপাসনার উদার মণ্ডপে আনিয়া উপবেশিত করাও। ইহাদেরও সকলকে লইয়া তোমাদিগকে সঙ্কল্প-মন্ত্র জপ করিতে হইবে,—জগন্মঙ্গলোঽহং

ভবামি। ইহাদেরও সকলকে লইয়া পবিত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রীর পাবন মন্ত্র তোমাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে মধুর কণ্ঠে গাহিতে হইবে,—ধীমহি। ইহাদিগকে দ্রুত বুকের কাছে পাইবার জন্যও তোমাদের মণ্ডলী গঠনের প্রয়োজন।

পণ করিবে, যতটুকু সম্ভব, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া চলিবার। যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, ততটুকু বল,—এই মহাবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া প্রতিটি কাজ কর। ছাত্রসমাজ, ছাত্রীসমাজ, বিবাহিত-সমাজ, বিপত্নীক-সমাজ, বিধবার-সমাজ, সধবার-সমাজ সর্ব্বত্রই তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যবাণী ছড়াইয়া যাইতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার কেপ টাউনে চুরানব্বই বৎসরের বৃদ্ধ এক পিতামহ, পঁচাত্তর বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা পিতামহীকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহের অগণিত পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে পড়িয়াছ। বৎসরেক আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক চুয়াত্তর বৎসর বয়স্কা কোটিপতি রমণীর আঠারো-বিশ বৎসর বয়স্ক এক নবযুবককে বিবাহ করার সংবাদটীও বোধ হয় স্মরণে আছে। এগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত উন্নতির নমুনা। এগুলি ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত নহে, ভারতবর্ষের আদর্শও নহে। ভারতবর্ষের আদর্শ আলাদা। তাহা ত্যাগসুন্দর, তাহা সংযম-সুরভি, তাহা জান্তব রিরংসার চপল প্রবণতার অনেক ঊর্দ্ধে।

প্রত্যেক কর্ম্মীকে ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ হইতে অনুরোধ কর। আমার যাহারা কর্ম্মী, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণের চেষ্টাই হোক তাহাদের আদিম

ভিত্তি। মাত্র তিনটী দিন তিনটী রাত্রি যে সংযমী থাকিবে, চতুর্থ দিন তাহার কণ্ঠে আমিই কথা কহিব। সে বাণী কেহ অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। তিন মাস যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাহার ভিতরে আমি বজ্রের বহ্নি আর হিমাদ্রির তুষার একত্র মিলাইব, তাহার আর সমকক্ষ কেহ থাকিবে না। তিন বৎসর যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাহার বাক্যে, মনে, দেহে ও ইন্দ্রিয়ে আমি নিয়ত বিরাজ করিব। তাহার জগন্মঙ্গলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে ব্রহ্মাণ্ডের কেহ স্তব্ধ করিতে পারিবে না। তোমরা দিকে দিকে ব্রহ্মচর্য্যের বার্ত্তা প্রচার কর। ভারতের অভ্যুদয় ব্রহ্মচর্য্যে হইবে, অন্য কিছুতে নহে। ভারত জগতের প্রচলিত জ্ঞানবিজ্ঞান কোনও কিছুকেই অবহেলা করিবে না কিন্তু তাহার জীবনভিত্তির গঠন হইবে ব্রহ্মচর্য্যে। তোমরা একজনেও ব্রহ্মচর্য্যকে ভুলিও না, কাহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা ভুলিতে দিও না। নারীর পর নারীতে উপরত হইয়াও যাহাদের রমণ-পিপাসা মিটিল না, পুরুষের পর পুরুষ সম্ভোগ করিয়াও যাহাদের রিরংসার দাবী পূরিল না, তাহাদের রোগগ্রস্ত চিত্ত ভ্রান্ত যুক্তির আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তাকে টিটকারী দিয়াছে বলিয়া তোমরা একটুকুও বিচলিত হইও না। উহা শ্মশানোন্মুখ মুমূর্ষু রুগ্নের যুক্তিহীন বিদ্রূপ ও উহা তাহার বিকারের ঘোরে উচ্চারিত অর্থহীন ধিক্কার।

চতুর্দ্দিকে হাজার হাজার লোককে যাহা কহিতে বা কহাইতে শুনিতেছ, যাহা করিতে বা করাইতে শুনিতেছ, যাহা প্রচার করিয়া জনমত সৃষ্টিতে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে ও করাইতে উন্মত্তের গতিতে

ছুটিতে দেখিতেছ, তাহা যদি মানিয়া নিতে হয়, তবে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, এত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, এত কোরাণ ও হাদিস মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার পরেও মানুষ পশুত্বের আদিম স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বাহিরে সভ্যতার, সংস্কৃতির, উৎকর্ষের, উন্নতির দর্প, দম্ভ, জৌলুষ, চাকচিক্য ও চমৎকারিত্ব যতই অভিনব হউক, স্ত্রীর কাছে পুরুষ আর পুরুষের কাছে স্ত্রী গেলে তার আর রক্ষা নাই, তাহাকে কামকূপে ডুবিয়া কামদণ্ড ভুগিতেই হইবে। না, মানুষ এত নচ্ছার নহে। মানুষ ইহার চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে আসিয়াছে এবং সেই কথাটী তোমাদিগকেই প্রমাণিত করিতে হইবে।

মনের কথা প্রকাশ করিবার জন্য বা আজিকার কথা সাত যুগ পরেও স্মরণ করিবার সহায়তা দিবার জন্য জগতে যখন কুত্রাপি অক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ভারতের প্রাচীন ঋষির মনের দ্বারে পরম জ্ঞান আসিয়া বেদমন্ত্র রূপে হানা দিয়াছিল। ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই জ্ঞানকে বিশ্বের কুশলের জন্য ধরিয়া রাখার প্রয়োজনও আছে। তাঁহারা উপায় খুঁজিলেন। তাঁহাদের শিষ্যদল বারংবার আবৃত্তি করিয়া মন্ত্রসমূহকে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনে রাখিবার এই নিদারুণ অধ্যবসায় প্রসঙ্গে একই মন্ত্রকে কতবার কতরকমে যে উলটাইয়া, পালটাইয়া, স্মৃতির জিমন্যাষ্টিক করিতে হইল, তাহা অবর্ণনীয়। জটাপাঠ, মালাপাঠ আদি বেদমন্ত্রের নানারূপ পাঠের

প্রকরণ এই ভাবেই সৃষ্ট হইল। কিন্তু সহসা একদিন প্রাচীন ঋষি আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে স্মৃতি বাড়ে, ধৃতি বাড়ে, নিষ্ঠা বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে, বল বাড়ে। বাড়িবার রাস্তা তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে পাইলেন। ইহা একটা আকস্মিক প্রবর্ত্তন নহে, ইহা একটা অর্থহীন কুলগত কুসংস্কারই নয়।

তোমরা তোমাদের সকল আন্দোলনে, সকল প্রচারণে, সকল প্রসারণে, সকল অভ্যুদয়ে, সকল বিস্তার-সাধনে ব্রহ্মচর্য্যকে মূলমন্ত্র কর।

নানা জনে নানা মতের নানা পথের প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাহাদের কাজ করিতে দাও। কিন্তু যাহাদের প্রচারণার ফলে জাতির ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠা বা ব্রহ্মচর্য্যের আস্থা কমিয়া যাইবে, জানিও, তাহারা দেশ ও জগতের ক্ষতি করিতেছে। তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাক। তাহারা যাহা বলিবার আর যাহা করিবার, করিয়া যাউক, তুমি তোমার প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিও।

ব্রহ্মচর্য্য পালিতে পালিতে কেহ হঠাৎ স্খলিত হইলে ইহা দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু তাহার স্খলনটাকে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, যদি সে আবার উঠিবার জন্য চেষ্টায় লাগে। সুস্থির ব্রহ্মচর্য্য, অটল সংযম দীর্ঘকাল চেষ্টার পরে আসে। এই অটল অবস্থায় পৌছিবার পথে দুই দশ বার যাহাদের পতন ঘটিয়াছে, তাহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহারা পতিত অবস্থাকেই জীবনের শাশ্বত স্বভাব বলিয়া এক কথায় বিনা যুদ্ধে মানিয়া

নিয়াছে। যাহাকে যেখানে দেখিতে পাও নিজ নিজ চরিত্রের গোপনতম প্রকোষ্ঠ হইত অসংযমকে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য বিপুল সংগ্রামশীলতা তাহাকে দান কর। আমার সন্তানের কাছে জগদ্‌বাসী ইহা প্রত্যাশা করে। পশুরা পক্ষীরা কামোদ্দীপন-কালে নিজেদিগকে সংযত করিতে পারে না কিন্তু মানুষ তাহার ইচ্ছাশক্তির বলে তাহা পারে। মানুষের ভগবৎ-সাধন তাহার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলতর ও বলবত্তর করিয়া থাকে। মানুষ ভগবৎ-সাধনের সহস্র প্রকারের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। পশুপক্ষীরা তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তথাপি মানুষকে পশুপক্ষীর পর্য্যায়েই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে দুই চারি লক্ষ শতাব্দীর পথ পশ্চাদ্ধাবন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ত্যাগ ও সংযমই মানুষকে মহিমান্বিত করিয়াছে, নতুবা মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৫
বুধবার, (৭-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতদিন চিকিৎসকেরা একটী প্রাণীকেও আমার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেন নাই, এখন সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ রবিবার তাহা দিতেছেন। রবিবার আমি মাণিকতলা ছায়া ছিনেমার ত্রিতলে অখণ্ডমণ্ডলীতে প্রাতে ৮টা ৩০ মিনিট কি ৯ টায় গিয়া উপাসনায় যোগ দেই, ব্যাকুল দীক্ষার্থী থাকিলে দীক্ষাও দেই, এবং অপরাহ্নে কাঁকুড়গাছিতে গুরুধামে সকল দর্শনার্থীকে দর্শন দেই। রবিবারের এই নিয়মটা আমি আজীবন কঠোর ভাবে রক্ষা করিয়া যাইব। নতুবা ভক্ত-নামধারী অত্যাচারকারীদের উৎপীড়নে এই শরীর কার্য্যক্ষম রাখিতে পারিব না। তোমরা কেহই রবিবার বিকালে ছাড়া গুরুধামে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও না।

এখনো শরীর খুবই দুর্ব্বল। সূর্য্য উঠিবার আগে মাত্র দুই চারিদিন পরে পরে আস্তে আস্তে পাঁচ বা দশ মিনিটের মতন রাস্তায় হাটিয়া আসি। সঙ্গে শ্রীমান অসীম থাকে। সূর্য্য উঠিবার আগেই গুরুধামে ফিরিয়া আসি। গায়ে সূর্য্যরশ্মি বা তাপ লাগান ডাক্তারের কড়া নিষেধ।

সারা দিনই অল্প অল্প করিয়া কিছু না কিছু খাই। শরীর নাকি খুবই কাহিল হইয়াছে, কতক্ষণ পরে পরেই নাকি কিছু খাদ্য প্রয়োজন। আগে হইলে বারংবার খাইতে বিরক্ত বোধ করিতাম, এখন কিন্তু খাইতে ভালই লাগে। খাদ্যের প্রতি ইহা আমার লোভ কি না, তাহা মাঝে মাঝে বিচার করি। ভগবানের কাজের জন্য শরীর, শরীরের জন্য খাদ্য কিন্তু খাদ্যের জন্য শরীর নহে

অথবা আমার এই তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর শরীরের জন্যও ভগবান নহেন। কাজ করা নিষেধ, অতএব এই সব ভাবি।

আর একটা ভাবনা আমাকে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহা এই যে, লক্ষাধিক নরনারী ত' আমার নিকটে দীক্ষা নিয়াছে, তাহারা সাধন করিতেছে কি? সত্য সত্য সাধন করিলে লক্ষ লোকের আভ্যন্তরীণ শক্তি কি বাহিরে একটা বিপুল মূর্ত্তি ও বিরাট্ মহিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত না? ইহারা সত্যই যদি সাধনাই করে, তবে দিগঙ্গনে ইহাদের শুচিশুদ্ধ চিত্তের উন্নত অনুভবগুলি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তালে, ছন্দে, সুরে অনুপম হইয়া কেন প্রকাশ পাইতেছে না? কেন আজ চারি দিকে প্রেতের তাণ্ডব আর ভূতের নৃত্য দেখিয়া দেখিয়া মানুষ খিন্ন, ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, অবসন্ন হইতেছে? আমার সন্তানেরা জগন্মঙ্গলের সাধন পাইয়াছে, জগতের মঙ্গল চিন্তা না করিয়া তাহাদের ব্রহ্মনাম জপেরও অধিকার নাই। আমি ছোট-বড়র ভেদ-বিচার না মানিয়া উচ্চনীচ প্রত্যেককে ব্রাহ্মণের সাধনার অধিকারী করিয়াছি। ব্রাহ্মণের জীবন জগতের কল্যাণের জন্য, ব্রাহ্মণের সাধনা শুধু নিজের মুক্তিটুকু লইয়া শেষ হয় না, তাহা চাহে নিখিল বিশ্বের মুক্তি। আত্মোৎসর্গই ব্রাহ্মণের জীবনের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণেরাও ভয় বশতঃ, কুণ্ঠা বশতঃ, দুর্ব্বলতা বশতঃ, অজ্ঞতা বশতঃ বা তুচ্ছ তুচ্ছ খণ্ডিত স্বার্থের লুব্ধতা বশতঃ যে মহা-ওঙ্কারের সাধনা হইতে স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে, আমি অকাতরে এবং সাদরে

সেই মহাসাধনায় তোমাদিগকে দীক্ষিত করিতেছি। কিন্তু আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তোমরা কি শুধু হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্যই দীক্ষা নিয়াছ, না কি দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য কাজ করিতেছ। এ প্রশ্নের জবাব আমি মুখের ভাষায় বা কাগজের উপরে কলমের আচড়ে চাহি না। এ প্রশ্নের জবাব আমি চাহি কর্ম্মে, তোমাদের জীবনের জাগ্রত রূপটুকুতে, তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহত্ত্বের বিকাশে।

নিখিল জগৎকে তোমাদের আত্মীয় করিতে হইবে, পর কেহ থাকিবে না। দীক্ষা দ্বারা যাঁহাদের আত্মীয় হইয়াছ, তাঁহারাই জগতের তোমার সব আত্মীয় নয়। যাঁহারা তোমার গুরুর কাছে বা তোমার সমমতে দীক্ষা নেন নাই, নিবেন না, তাঁহারাও যে তোমার পরমাত্মীয়, এই কথাটীর পূর্ণ উপলব্ধি তোমার অন্তরে জাগিবে, তবে তুমি প্রকৃত অখণ্ড হইলে। দৃষ্টির এই যে একটী উদার প্রসার, তাহা অন্যত্র সুলভ্য না হইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধনের অধিকারী তুমি, তোমার পক্ষে, তোমার ক্ষেত্রে, তোমার জীবনে দুর্ল্লভ হইবে কেন? দৃষ্টির এই উদার প্রসারই ত' অখণ্ডের জীবনের একমাত্র বিশেষত্ব। নতুবা, জগতে অহরহ সম্প্রদায় ত' কতই সৃষ্ট হইতেছে, বিলয়ও পাইতেছে। অনুভবে, আচরণে আকাঙ্ক্ষায় ও প্রতীক্ষমাণ আশায় তোমরা বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর আত্মীয় হইতে আত্মীয়তর, নিকট হইতে নিকটতর হইবার চেষ্টা করিবে, ইহাই ত' তোমাদের কাছে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই বাঞ্ছাপূরণের পথে তোমরা কি অগ্রসর হইতেছ?

একজন গুরুভাই বা গুরুভগিনীর সহিতও তোমার আত্মীয়তা কম নহে। মায়ের পেটের ভাইবোনের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তার চেয়ে ইহা অনেক বেশী দিনের। চলতি কথায় বলে, মা-বাপের সম্পর্ক এক জন্মের, গুরুর সম্পর্ক কোটি জন্মের। কথাটী গ্রাম্য লোকদের মুখেই শোনা যায়, যাহারা অনেক লেখাপড়া করে নাই, অনেক বুদ্ধি ও বিদ্যার গৌরব করে না কিন্তু কোনও না কোনও একজন গুরুর আশ্রয়ে আসিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার কোনও প্রকার অনুশীলন করে, তাহারা নিজ গুরুর সহিত সম্বন্ধকে শাশ্বত, অনন্ত ও অফুরন্ত বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তাহারা গুরুভাইকে গুরুবোনকে দুদিনের আত্মীয় বলিয়া মনে করে না, যেমন করে মায়ের পেটের ভাইবোন্‌কে। তাহারা বলে, মায়ের পেটের ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বার্থের, গুরুভাই-গুরুবোনের সহিত সম্পর্ক পরমার্থের। স্বার্থ দুদিনের,পরমার্থ চিরদিনের। সুতরাং গুরুভাই এবং গুরুবোন্ অনেক বেশী আপন।

গুরুভাই ও গুরুভগিনী সম্পর্ক অতীব পবিত্র। অনেক সময়ে নিকট আত্মীয়েরাও কাহারও জন্য তেমন সেবা করে না, যাহা গুরুভাই বা গুরুভগিনীরা করে বা করিতে পারে। তোমাদের এলাহাবাদ-নিবাসী একটী গুরুভাই কলিকাতায় আসিয়াছে মারাত্মক একটী অপারেশন করাইতে। আত্মীয়-স্বজন কজনই আছে কিন্তু কাজের বেলা কাহাকেও পাওয়া গেল না। কলিকাতা মণ্ডলীর প্রদীপ, দুলাল আর সুশীল গেল রক্ত দিতে। কার্য্যকালে দেখা

গেল যে সুশীলের রক্তের চাপ অত্যন্ত কম, তাহার রক্ত নেওয়া যায় না। দুলালের রক্ত নেওয়া যায় না, তাহার জণ্ডিস্ আছে। প্রদীপ অকাতরে রক্ত দিল কিন্তু আরও রক্ত চাই। রামকান্ত গিয়াছিল শুধু সঙ্গী রূপে। কিন্তু অম্লান বদনে সে টেবিলের উপরে চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল, "আমার রক্ত নিন ডাক্তারবাবু, গুরুভাইয়ের জীবন রক্ষা করিতেই হইবে।" রামকান্তের বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্যও বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; সে এত দুর্ব্বল যে আমি সমক্ষে থাকিলে তাহাকে রক্ত দিতে দিতামই না, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অন্য কাহাকেও টানিয়া আনিতাম। তবু রামকান্ত অকাতরে নিজ শরীর হইতে এক বোতল রক্ত দিয়া আসিল। এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের সহোদরকেও অনেকে রক্ত দিতে চাহে না বা সাহস পায় না। রামকান্ত চাহিল এবং সাহস পাইল। রক্তদানের আনন্দে দীপ্তিভরা মুখখানা নিয়া যখন রামকান্ত আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, আমি বলিলাম,—"আমি গুরু, রক্তদান আমারই উচিত ছিল। আমার ঋণ তুই শোধ করিলি?"

ইহারই নাম গুরুভাই। ভুরুভাই সম্পর্কটী শুধু পবিত্রই নহে, ইহা এক পরম দায়িত্ব। তোমার দীক্ষালব্ধ সাধন যে আদর্শের প্রতীক, তোমার গুরুভাই বা গুরুবোনেরাও সেই আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে মূর্ত্তিমন্ত করিবেন, তবেই তাঁহারা গুরুভাই বা গুরুবোন থাকিবেন। বীমা কোম্পানীর দালাল গুরুর কাছে দীক্ষা লইল শুধু গুরুভাইদের জীবন বীমাবদ্ধ করিয়া কমিশন অর্জ্জনের লোভে। নূতন পাশকরা ডাক্তার গুরুর কাছে দীক্ষা লইল

গুরুভাইদের বাড়ীতে ও তাহাদের পরিচিত লোকদের বাড়ীতে রোগী পাইবার লালচে। ব্রীফলেস উকিল গুরুর কাছে দীক্ষা লইল শুধু গুরুভাইদের পরিচয়ে মক্কেল বাগাইবার ফন্দীতে। এমন লোকেরা তোমার গুরুর কাছে দীক্ষিত হইলেও হয়ত গুরুভাই হইতে পারিল না। যে তোমার গুরুভাই হইল, তোমার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে, তাহার প্রতিও আছে তোমার কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য নিঃস্বার্থ সেবার। তাহার সহিত স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নাই, নীচতা, হীনতা, আত্মসুখলুব্ধতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বা ইতর কোনও কিছুর সহিত তাহার সংস্রব নাই। আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব সত্যিকার সম্বন্ধে পরিণত হইবে কিন্তু আদর্শ কি রূপবন্ত হয় অসাধকের জীবনে? তাই, যাহারা সাধন করে না, তেমন গুরুভাইকে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করা ভুল।

গুরুভাইদের সহিত আত্মীয়তা দাবী করিতে হইলে নিজেরও সাধন করিতে হয়। গুরুর প্রতি আনুগত্যই শিষ্যের একমাত্র গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, গুরুদত্ত সাধনে নিষ্ঠাপূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকিবার চেষ্টাটুকুও শিষ্যের থাকা চাই। যে মনে প্রাণে শিষ্য হইল না সে তোমার গুরুভাই বনিল কি করিয়া? যাহারা মনে প্রাণে প্রকৃত শিষ্য হইতে চাহিল না, গুরুদত্ত আশীর্ব্বাদকে নিজ নিজ জীবনে রূপবন্ত করিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পাইল না, তাঁহারা পরস্পর গুরুভাই রহিল কি করিয়া? কেহ নিজেকে

তোমার গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিলেই সে গুরুভাই হইল না। তাহার জীবনে প্রকৃত শিষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শিষ্যত্ব মানে গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি, অনন্যসাধারণ আনুগত্য, গুরুদত্ত সাধনে অপরাজেয় নিষ্ঠা এবং গুরুদত্ত সাধন যে আদর্শের প্রতীক তাহা নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অতুলনীয় অধ্যবসায়।

সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের বল চাই। যে যতটুকু পারে, ইন্দ্রিয়সংযমী হউক। যে ছিল ষোল আনা অনাচারী, সাধন-শক্তি বর্দ্ধনের প্রয়োজনে সে পনের আনা, চৌদ্দ আনা, তের আনা, বারো আনা ব্রহ্মচারী হইবার চেষ্টা করুক। এই চেষ্টা করিতে গিয়া সে যদি বারংবার পরাজিতও হয়, তবু এই চেষ্টাটুকুরই ফলে ক্রমশঃ তাহার সাধনে দানা বাঁধিবে। ইহা কাল্পনিক কাহিনী নহে, ইহা বহুজনের জীবনে পরীক্ষিত এক অমোঘ সত্য। যৌনচিন্তাজীবী সাহিত্যিকেরা গল্প-উপন্যাসে মানব-মনের যে ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই মানুষের মনের সম্পর্কে শেষ কথা নহে। মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে ইহারা একদেশদর্শী। যোগীরা মানুষের মনের আরও একটা দিকও দেখিয়াছেন, যাহা ইঁহাদের নিকটে অপরিজ্ঞাত। প্রধানতঃ অর্থাগমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল সাহিত্যজীবীদের লেখনী চালাইতে হয় বলিয়া ইঁহারা ঐ একটা দিকের ন্যক্কার ঘাটিতে আনন্দ বোধ করেন। বিহার-প্রবাসী একজন বিখ্যাত গল্পলেখক একদা আমাকে বলিয়াছিলেন,—"স্বামীজী, আপনার জীবনটাকে

আদর্শ করিয়া আমি একটা উপন্যাস লিখিব।" আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলাম,—"না মহাশয়, অন্য কাহাকেও আদর্শ করুন। আমার জীবনটাকে লিখিতে বসিয়া শেষে আপনি শিব গড়িতে বানর না গড়িয়া বসেন।" সাহিত্যিক ভদ্রলোক আমার উপরে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

অপরেরা বিদ্রূপ, ভ্রূকুটি, আলোচনা বা নিন্দা যাহাই করুন, তুমি তোমার গোপন জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে ঠাঁই দিবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য দাও। যে যতটা পারে, ততটাই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তোমাদের যে গুরুভাইটী অফিস-ফেরৎ আসিয়া আমাকে পত্র লিখিতে সাহায্য করে, সে সংসারী কিন্তু আজ আট বৎসর ধরিয়া সস্ত্রীক পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে। ইহা তাহার গুপ্ত জীবন। তাই বাহিরে ইহা প্রকাশের প্রয়োজন কিছুই নাই। সে তাহা করেও না। কিন্তু তাহার ব্রহ্মচর্য্য তাহাকে যে অপরিমিত গুরুসেবার সামর্থ্য দিতেছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি। আমার অনেক বহু-বিজ্ঞাপিত ও শ্রুতকীর্ত্তি শিষ্য অপেক্ষা এই একটী লোক বর্ত্তমানে আমার অনেক বেশী কাজ করিয়া দিতে পারিতেছে এবং একথা ত' তোমরা জান যে, আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমার কোনও কাজই নাই, সব কাজই পরার্থে।

ব্রহ্মচর্য্য শুধু সাধনে রুচি বর্দ্ধন করে, তাহাই নহে। ব্রহ্মচর্য্য পরহিতচিন্তারও যোগ্যতা বাড়ায়। ব্রহ্মচর্য্যকে আমি দেশ ও সমাজের সকল ব্যাধির মূলোৎপাটক বলিয়া অনুভব করিয়াছি।

বস্তুতন্ত্রবাদীরা যিনি যাহাই বলুন, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অকৃত্তিম অনুরাগ আসিলে, সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান আপনা আপনি হইয়া যাইবে। অনেক মহামতি ব্যক্তি মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি মিটাইবার জন্য আমৃত্যু চিন্তা করিয়া গিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও চিন্তা বহুশতাব্দীব্যাপী ইতিহাস সৃষ্টির উপাদানও যোগাইয়া যাইতেছে কিন্তু অন্তরের রাগদ্বেষকে অনুশীলন ও পরিশীলনের সাহায্যে বিশ্বতোমুখ প্রেমে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা ইঁহারা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। কেবল দাবী আদায় এবং দাবী মিটান দ্বারাই মানুষের সকল সমস্যার কদাচ সমাধান হইতে পারে না। প্রেমেই সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রেমের মূল ব্রহ্মচর্য্য।

আজ একজন দুঃখক্লিষ্ট লোকের পত্র পাইলাম। তাহার দারিদ্র্য শোচনীয় এবং অবস্থা অস্বস্তিকর, পত্র হইতে ইহাই প্রতিভাত হইল। কিন্তু সমগ্র দেশ জুড়িয়া বেকার-সমস্যা চলিয়াছে। কে কাহার জন্য কি করিতে পারে? আমি সাময়িক ভাবে দু-পাঁচ জনকে দু-দশ-পঁচিশ বা হাজার-দুহাজার টাকা দিয়া দেখিয়াছি, ইহারা টাকা আর ফেরৎ দিবার চেষ্টা করে না। ফলে, এই টাকাগুলিই পুনরায় ঘুরিয়া অন্য বিপন্নকে যে সাহায্যটা করিতে পারিত, তাহার পথ অবরুদ্ধ। এখন আমি আর কাহারও বিপদ দেখিলে টাকা পাঠাই না। পাঠাইবই বা কোথা হইতে? আমার ব্যক্তিগত অর্থভাণ্ডার বলিয়া কিছু নাই। অযাচক আশ্রমের টাকা

আমি স্পর্শও করি না, কারণ তাহা জনকল্যাণে দান করিয়াছি। মালটিভারসিটির টাকাও দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে আমি টাকা দেই কি করিয়া? নিজেকে ক্লেশ দিয়া তবু দিয়াছি। মানুষের বিপদ দেখিয়া দিয়াছি। কিন্তু ইহারা শুধু নিজেদের বিপদই দেখিবে, অন্য লোকের বিপদের জন্য দুশ্চিন্তা ইহাদের নাই। এই যে স্বার্থপরতা, ইহা আমার মতে চরিত্রভ্রংশতা। জাতির চরিত্রভ্রংশতা দূর না হইলে শুধু দান করিয়া কেহ দেশবাসীর দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। যে সাহায্য নিতেছে, সে অপরকে সাহায্য দানের সহায়তা করিবে না। তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা চিত্তরঞ্জন দাশ দানই করিয়াছেন। আমার পুণ্যশ্লোক পিতামহ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়কেও কেবল দানই করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু দান করিয়া তাঁহারা ত' জাতির দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

সুকৌশলী ইংরাজ দুই বিশ্বযুদ্ধ কালে এদেশে কৃত্রিম দারিদ্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সৈনিক বা সেনানিবাসের কেরাণী সংগ্রহ করা। যাহারা হযত একদা নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিঃস্বার্থ সেবক রূপে যোগদান করিত, এমন নিষ্পাপ-চিত্ত তরুণেরা নিজ নিজ মাতাপিতার মুখের অন্ন জোগাইবার জন্য সৈন্যদলে নাম লিখাইল। কিছু দিনের জন্য অন্ন তাহারা ঠিকই পাইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও যাহা পাইল, তাহা মারাত্মক। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া স্বার্থপর লুব্ধদৃষ্টি আঁখি মেলিয়া চাহিল। যুবকদের ভিতর হইতে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবার ভাব

অন্তর্হিত হইল। একটা বিপ্লবোন্মুখ জাতির যুবক-সমাজে এক গুরুতর নৈতিক অধোগতি ঘটিল। পরের জন্য নহে, সবাই শুধু নিজের জন্য বাঁচিতে চাহিল। দেশের চরম সর্ব্বনাশ হইল।

দেশব্যবচ্ছেদ দারিদ্র্য-সমস্যাকে একটা চরম পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ছাড়া এই দুরবস্থার উল্লেখযোগ্য অপসারণ সম্ভব কি না, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে, আমরা অন্য ভাবে আজীবন চিন্তা করিয়া আসিতেছি। তাহাতে সমস্যার একটা সমাধান মিলিবে। তাহা এই যে, প্রত্যেকটী মানুষ অনুধাবন করুক যে, তাহার জীবন সমগ্র সমাজের সেবার জন্য। সমগ্র সমাজ তাহার অভাব পূরণের জন্য, সে কাহারও জন্য নহে, ইহাই ত' হইয়াছে হাল ফ্যাশানের মনোভঙ্গী। "না, তাহা থাকিলে চলিবে না। তোমার জীবন সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য, তোমার নিজের জন্য নহে, এই ধ্যানে তোমার মন ভরপূর হউক। জীবিকার সন্ধানে উন্মত্ত না হইয়া সেবার পন্থা আবিষ্কারে তুমি আগ্রহী হও, ব্যাপৃত হও, নিমগ্ন হও", —ইহাই আমি সেই পত্রলেখককে লিখিয়াছি। ব্যাপক ভাবে যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বেকার-সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান মিলিবে।

হিন্দুদের ভিতরে সকলেই সংসারী করেন না, অনেকে সন্ন্যাসী হইয়াও যান। কিন্তু কয়জন সন্ন্যাসী নিজের মুক্তির ছাড়া অন্যের বিষয়ে ভাবেন? কয়জন সন্ন্যাসী নিজ আশ্রমের কল্যাণের বাহিরে

চিন্তা-দূতকে প্রেরণ করেন? ইঁহারা সমাজ-অঙ্গের জলৌকা, অবিরাম সংসারী লোকের রক্ত শোষণ করিয়া ইঁহারা ধর্ম্মপালন করেন। ইঁহাদের মধ্যে গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক, ঐশ্বরিক-শক্তিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি আছেন কিন্তু দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান ইঁহাদের নিকটে নাই।

খ্রীষ্টানদের ভিতরে সব লোকই কি চাকুরী করে, না ব্যবসায় করে? কত লোক সেবাধর্ম্মে আত্মদান করিতেছেন, কেহ সংসারী হইয়া, কেহ সংসারী না হইয়া। বনে, পর্ব্বতে, নিতান্ত দুর্গম স্থানে, সর্পশ্বাপদসঙ্কুল বিপজ্জনক অঞ্চলে হাতী, গণ্ডার, কলেরা, বসন্ত কোনও-কিছুকে গ্রাহ্য না করিয়া ইঁহারা ছুটিয়া চলিয়াছেন প্রভু যীশুর গুণগান শুনাইতে আর মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে সেবা দিতে। সমাজ কেবল ইঁহাদের উদরান্নই চালাইতেছে না, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন আছে, তাঁহাদিগকে সংসার-পালনের টাকাও দিতেছে। বলিবে, হিন্দুজাতির দানস্পৃহা নাই কিন্তু মানুষের সেবাস্পৃহা না দেখিলে দাতার দান কি আসিয়া মরুভূমিতে জমা হইবে? কয়টা সেবা-প্রতিষ্ঠানে ত' হিন্দুদের কোটি কোটি মুদ্রা আসিয়া জমিয়াছে কিন্তু যেখানে সেবা-স্পৃহার অপহ্নব ঘটিতেছে, সেখানে দাতারাও হস্তসঙ্কোচ করিতেছেন।

বহু দেবতার পূজা আর ঈশ্বরোপাসনার নামে বাহ্য আড়ম্বর, ইহার মধ্যেই হিন্দুর দানশক্তি অপচয়িত হইয়া যাইতেছে। ফলে সমাজকল্যাণ-মূলক কর্ম্মে হিন্দুর হাত খোলে না, খ্রীষ্টানের খোলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং পরবর্ত্তী কালের পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হরেন মুখোপাধ্যায় জীবনের সমস্ত উপার্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিয়া গেলেন। ইহা ত' এই সেই দিনের ঘটনা।

আমরা যে সমবেত উপাসনা করিতেছি, দেখ, তাহাতে বৃথা আড়ম্বরের কোনও অবকাশ নাই, তবু তোমরা আড়ম্বর ঢুকাইতেছ। উপাসনাকে জটিলতাপ্রমুক্ত, কুটিলতাবিমুক্ত, সহজ, সরল, সাবলীল ও ভেদ-বিদ্বেষ-রহিত করিবার জন্য আমি যত চেষ্টা করিতেছি, তোমাদের চিরকালের আড়ম্বরের অভ্যাস ততই নূতন নূতন প্রথার সৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এগুলি অসঙ্গত, অসমীচীন ও অন্যায়। একমাত্র পূজার বেদী ছাড়া অন্যত্র অখণ্ডনাম লিখিত হইবে না, আর তোমরা উপাসনা-মণ্ডপের তিন দিকে তিনটি তোরণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া রাখিতেছ "ওঁ"। কেন, "হরিওঁ" লিখিতে পার না? আমাদের সমবেত উপাসনায় ঘটের কোনও প্রয়োজন হয় না, তবু তোমরা ঘট বসাও, তাতে আবার প্রাচীন প্রথানুযায়ী একটা মানুষের মূর্ত্তি আঁক। মাঙ্গল্য হিসাবে মঙ্গলঘট বসাও, দোষ নাই, বরং ইহা একটা শোভা। কিন্তু তাহাতে মানুষের মূর্ত্তিই বা কেন আঁকিবে, আবার নববস্ত্র ও নারিকেলই বা কেন বসাইবে? দ্রাবিড় সভ্যতার প্রতীক রূপে বা শোভারূপে ডাব বা পক্ক নারিকেল বসান বরং মানিয়া লইলাম কিন্তু নববস্ত্রটীর কোন্ প্রয়োজন?

ঢাক-ঢোল-করতাল-কাসী বাজাইয়া কতক্ষণ আবার নৃত্য করিয়া আরতি দিলে! সমবেত উপাসনায় এই আরতির কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা যে "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" সকলে মিলিয়া গাহি, ইহাই আমাদের আরতি। অখণ্ড সংহিতা পাঠ দিয়া উপাসনা শুরু হইয়া গেল, হঠাৎ একজন গান ধরিয়া বসিল—"এক দিকে চল্", নতুবা "যে আছ যেখানে" কিম্বা "খণ্ড আজিকে"। কেন তোমরা এসব নবপ্রবর্ত্তন করিবে? তাহার প্রয়োজনই বা কোথায়, উপযোগিতাই বা কি? উপাসনা চলিতেছে, হঠাৎ একজনে বলিয়া বসিল "মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিলেন না? এই হইল মন্ত্রের অর্থ। এখন ভাবিয়া দেখুন আমরা কত বড় উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উপাসনায় বসি। এসব প্রসঙ্গের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। উপাসনার মন্ত্রার্থ বা মহিমা তাৎপর্য্য বা শ্রেষ্ঠত্ব লোককে বুঝাইয়া দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল কাজ কিন্তু সে কাজটী অন্য সময়ে করিবে, উপাসনার সময়ে নহে। উপাসনার এক অংশে হরিওঁ কীর্ত্তন আছে। তোমরা আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরিয়া শুধু কীর্ত্তনই চালাইলে এবং দুজন আবার দুইটী বাদ্যযন্ত্র লইয়া বসিলে। এগুলি অন্যায়। হরিওঁ কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর নির্দ্ধারিতই আছে। ১,৩,৪,৩,১,৩, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পংক্তির সুর নির্দ্ধারিত। পঞ্চমপংক্তির সুর অবিকল তৃতীয় পংক্তির ন্যায়, ষষ্ঠ পংক্তির সুর অবিকল প্রথম পংক্তির ন্যায় এবং সপ্তম পংক্তির সুর অবিকল তৃতীয় পংক্তির ন্যায়। কোন্ সুরটীর পরে কোন্ সুর হইবে, নিম্নে লিখিতেছি, ১,

২, ৩, ৪, ৩, ১, ৩। যদি একটী সুর একবার মাত্র গাহ, তাহা হইলে সাত পংক্তি গানের পরেই সমবেত উপাসনার কীর্ত্তন থামিবে। যদি প্রতিটি সুর দুইবার করিয়া গাহ, তাহা হইলে নিম্নরূপ হইবে, ১,১,২,২,৩,৩,৪,৪,৩,৩,১,১,৩,৩। অর্থাৎ এক পংক্তি হরিওঁ দুইবার করিয়া মোট চৌদ্দ পংক্তি হরিওঁ গাওয়া হইবে। সমবেত উপাসনা-কালে ইহার অতিরিক্ত বার হরিওঁ কীর্ত্তন হইবে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তোমাদের ইহা মান্য করিতেই হইবে। উপাসনা শেষ হইবার আগে অঞ্জলির ফুল লইয়া অনেক স্থানে মারামারি হুড়াহুড়ি হয়। ইহার কোনও প্রয়োজনই নাই। উপাসনায় বসিবার কালেই নিজ নিজ পুষ্পবিল্বপত্রাদি হাতে লইয়া বসিতে পার। প্রসাদ লইবার কালে আর একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধে। ইহাও নিষ্প্রয়োজন। বহির্নির্গমের রাস্তায় আগে ঠোঙ্গাতে প্রসাদ সাজাইয়া কর্ম্মীরা দাঁড়াইয়া থাকিলে এক একজন বাহির হইবার সময়ে বিনা কোলাহলে প্রসাদ বিতরণ হইতে পারে। হৈ চৈ এবং বিশৃঙ্খলার নাম উৎসব নহে, ধ্যানপ্রশান্ত চিত্তের মধ্যে উপাসনা-লব্ধ ব্রহ্মানন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম উৎসব।

আর একটা ব্যাপারে তোমরা যে কেলেঙ্কারী কর, তাহা একেবারে ক্ষমার অযোগ্য। উপাসনা শেষ হইবার পরে উপাসনার প্রসাদ পাইয়া কেহ কেহ বাড়ীতে ফিরিতে চাহে। সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য রূপে পক্কান্ন ভোগ দেওয়া যাইবে না বিধায় তোমরা সেখানে অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া চল। কিন্তু উপাসনার প্রসাদটুকু লইয়া ঘরে ফিরিবার মুখে যদি তোমরা

সমাগত ব্যক্তিদের বল যে, খিচুড়ী বা পায়সান্ন অন্যত্র রান্না হইতেছে, তাঁহারা যেন তাহা খাইয়া তবে ঘরে যান, তাহা হইলে এমন হওয়া বিচিত্র নহে যে, কাহারও কাহারও ঐ সময়ে খিচুড়ী বা পায়সান্ন ভক্ষণ সম্ভব নহে। কেহ যদি নিজের অসুবিধা জানাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, আর তোমরা যদি তখন তাহাকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বা জাতি তুলিয়া গালাগালি করিয়া বা তাহার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হেতু তাহার অহঙ্কার হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অসম্মান কর, তবে তোমাদের এই আচরণের ক্ষমা হইবে কি করিয়া? সমবেত উপাসনায় যাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ, সে তোমার আমন্ত্রিত অতিথি। তাহাকে অসম্মান করার কি তোমার অধিকার আছে? মনে কর, সে রবাহুত হইয়াই আসিয়াছে কিন্তু সমবেত উপাসনার সাত্ত্বিকতা বা পবিত্রতার সম্পর্কে তাহার ধারণা উচ্চ বলিয়াই আসিয়াছে। তোমাদের অনুষ্ঠিত আচরণের দ্বারা তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাটা কেন নষ্ট করিবে? সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আসিলে গৃহস্থের বাড়ীতে খেচরান্নও ভক্ষণ করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম আছে কি? যদি খেচরান্ন বা পায়সান্ন ভোজনের ব্যবস্থা কোথাও করা হয় এবং কেহ তাহা ভোজন করিতে অক্ষম বা অসম্মত হয়, তবে তাহার উপরে জিদ বা জবরদস্তি করা চলিবে, একথা তোমাদের কে বলিয়াছে? কিন্তু কোথাও কোথাও সত্যই জবরদস্তি করা হয়। ইহা অন্যায়।

সমবেত উপাসনায় খিচুড়ীর প্রয়োজন নহে। খিচুড়ীর আয়োজন যদি কেহ করে, তবে তাহা সখে করে বা অন্যতর

প্রয়োজনে করে। সখের ব্যাপার আর ধর্ম্মের ব্যাপার এক নহে। প্রয়োজনের ব্যাপার কখনও কখনও ধর্ম্মের আসল অঙ্গ নাও হইতে পারে। সমবেত উপাসনা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং এই আত্মনিমজ্জনের মধ্য দিয়া বিশ্বের সকলের সহিত একাত্মতার অনুভূতি লাভ। খিচুড়ী-ভক্ষণ এই অনুষ্ঠানের অঙ্গও নহে, উপাঙ্গও নহে। তোমার চাউল আছে, ডাইল আছে, লোককে ভরপেট খাওয়াইয়া দিবে, ইহা তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু যে উহা খাইতে পারিবে না বা খাইতে চাহিবে না, তাহাকে তুমি অসম্মান করিবে, ইহা তোমার নীচত্ব। মহত্ত্বের সহিত নীচত্বকে যুক্ত করা অসমীচীন, যেমন গব্য ঘৃতের সহিত সাপের চর্ব্বি মিশান অন্যায়। আমাদের সমবেত উপাসনায় আমরা সকল মতের সকল পথের লোককে যুক্ত দেখিতে চাহি। কিন্তু লোকে সমবেত উপাসনায় আসিলেই যদি তোমরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপরে বলপ্রয়োগ কর, তবে তাঁহারা আসিবেন কেন?

বলিতে পার,—"আমরা বাহিরের লোকের উপরে এই উৎপীড়নটা করি না, করি আমাদের নিজেদের গুরুভাই ও গুরুভগিনীদের উপরে।" এই কথার পরে কিন্তু অনেক কথা আসিয়া যায়। তুমি মলত্যাগ করিয়া প্রতিবারই বস্ত্র পরিবর্ত্তন কর কি? তুমি মূত্রত্যাগ করিতে প্রতিবারই জল নাও কি? তুমি যখনই আহার কর, আগে খাদ্যটী ভগবানে নিবেদন করিয়া লও কি? তুমি অখাদ্য, কুখাদ্য, নিন্দিত খাদ্য বর্জ্জন করিয়াছ কি? তুমি

ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র পাইবার পর হইতে নিজের ভিতরের শূদ্রত্বকে শত যোজন দূরে রাখিবার চেষ্টা সতর্ক ভাবে চালাইয়া যাইতেছ কি? তুমি প্রত্যহ চারিবার করিয়া গুরুদত্ত সাধনে বসিয়া যাও কি? তুমি অন্যায় ভাবে অর্থার্জ্জনকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ কি, ইতর-চরিত্র লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছ কি, নিজেকে সর্ব্বপ্রকার নেশা ও ইন্দ্রিয় দোষ হইতে দূরে রাখিয়াছ কি? তুমি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নামে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য প্রয়াসী রহিয়াছ কি? তুমি নিজের গৃহটীকে বহুদেবপূজার লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিয়াছ কি? তুমি প্রায় প্রতিটি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আনন্দ সহকারে যোগদান কর কি?

এই সকল প্রশ্নের যদি উত্তরে তুমি বুক ফুলাইয়া বলিতে পার "হাঁ", তবেই তুমি আমার দীক্ষিত অন্য একজনকে তোমার গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া দাবী করিতে পার, নতুবা নহে। এই সকল প্রশ্নের জবাব যদি তোমার ইতিবাচকই হয়, তবে জানিও তোমার বাড়ীতে খিচুড়ী খাইবার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি করিতে হইবে না। সে তোমার পায়ের ধূলি পর্য্যন্ত পরম ভক্তি সহকারে চাটিয়া খাইবে।

খিচুড়ীটাকে মাঝখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া তোমরা সমবেত উপাসনার সর্ব্বজনীনতাকে নষ্ট করিও না। খিচুড়ীর প্রতি প্রথাগত একটা অসম্ভব অনুরাগ তোমাদের সাত পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছে। এই জন্য তোমরা খিচুড়ী-পর্ব্ব ছাড়া কোনও অনুষ্ঠানকেই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতে পার না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,

খিচুড়ী-পর্ব্বকে অভিজাত অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য আমার জন্মোৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা শত শত স্থানে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় কর, তাহার সিকি অংশ জোর করিয়া স্থায়ী জনকল্যাণের জন্য ধরিয়া রাখিলে আজ আমি অনায়াসে একটার বদলে তিনটা মালটিভারসিটি হয়ত স্থাপন করিয়া যাইতে পারিতাম। তথাপি তোমাদের আনন্দহীন জীবন হইতে খিচুড়ী-মহোৎসবের আনন্দটুকু আমি কাড়িয়া লইতে চাহি না। কিন্তু খিচুড়ীকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা সমবেত উপাসনাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করিও না।

পত্রখানা একদিনে লেখা সম্ভব হইল না। আস্তে আস্তে তিন চারি দিনে লিখিলাম। ইতি ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৫

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা

সোমবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

(৩-৬-৬৮ ইং)

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিবাহ করিয়াছ, নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছ, যে জীবনটা

কৌমারভূমিতে দাঁড়াইয়া দূর হইতে কখনো কখনো কৌতূহলী নেত্রে দেখিয়াছ, সেই জীবনকে নিত্যকার জীবনে পরিণত করিয়াছ। কত বড় অপ্রত্যাশিত এক অভিজ্ঞতা, কত বড় নূতন এক দায়িত্ব। এত দিন সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাহার তরঙ্গরাজি দেখিয়া কখনো ভীত, উৎকণ্ঠিত হইতে, এখন সেই অকূল সমুদ্রে দুইটী তরুণ-তরুণী ক্ষুদ্র দেহতরী সম্বল করিয়া ঊর্ম্মিমালা লঙ্ঘন করিয়া পরমসুদূরের চিরকাঙ্ক্ষিত লসক্ষ্যর দিকে অগ্রসর হইবার জন্য নামিয়া পড়িয়াছ। এই সময়ে তোমরা হালটী শক্ত করিয়া ধরিতে কদাচ ভুলিও না।

আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখময়, শান্তিময় ও তৃপ্তিময় হউক। আরও আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের বিবাহিত জীবনের তপস্যার শুভফল অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে বিসর্পিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের কার্য্যবিবরণ পাঠে সুখী হইলাম।

পাঠ-কীর্ত্তন-উপাসনার আনন্দ অকৃপণ ভাবে চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিয়া চল। পাঠ-কীর্ত্তন-উপাসনার মধ্য দিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নিকটতর, নিকটতর হইতে নিকটতম হও। কেহ কাহাকেও দূরে রাখিও না, কেহ কাহাকেও দূরে থাকিতে দিও না। কেহ কাহাকেও পর ভাবিও না, পর থাকিতে দিও না। এই ধর্ম্মরাজ্যে সকলে পরমপ্রভুর সমান প্রিয় সন্তান, এই বিশ্বাস নিয়া চল। কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রীভগবানের প্রিয়তর, এই অভিমান অন্তরে রাখিও না। "আমি প্রিয়তর" এই বোধ জাগিলে অহঙ্কার আসে এবং অন্য ভক্তদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব উপজাত হয়। এই গর্ব্ব যে সাধকের সাধন-শক্তির কি সমূল নিপাত করে, তাহা বলিবার নহে। প্রকৃত প্রেমিক সর্ব্বদাই নিজেকে তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া অনুভব করিবে, কিন্তু অন্য অপেক্ষা প্রিয়তর, এই রূপ ভাবিলে গর্ব্ব আসিবেই আসিবে। ভগবানের চোখে সবাই সমান। তিনি যদি অসমান দেখেন, তবে সমান আর দেখিবে কে?

বাহিরে গিয়া সৎকাজ যতই কর, নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিটা বেশী প্রখর রাখিবে।

প্রত্যহ শয়নকালে ভগবানের নাম করিবে। নাম করিতে করিতে নিদ্রা আসিয়া গেলে বিনা কুণ্ঠায় ঘুমাইবে। ঘুমের মধ্যে কখনো জাগিয়া উঠিলে, পুনরায় নাম করিতে থাকিবে। বসিয়া বসিয়াই যে এ সময়ে নাম করিতে হইবে, তাহা নহে, শুইয়া

শুইয়া, নিজ সুবিধামতন কাত বা চিৎ হইয়া ভগবানের নাম চলিতে পারে। নাম করিতে করিতে আবার নিদ্রাগত হইবে। ইহার ফল বড় শুভ। নিদ্রায় অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনেও তোমার ঈশ্বরারাধনাই চলিতে থাকিবে এবং অবচেতন মনের স্তরে স্তরে যে সকল পূর্ব্বসংস্কার আদিম শৈশব হইতে লাগিয়া আছে সুযোগমত আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাকে একদিন হঠাৎ বিভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত, পথচ্যুত বা হতবুদ্ধি করিয়া দিবার জন্য, তাহারা আস্তে আস্তে নামের সমুদ্রে ডুব দিয়া নামময়, প্রেমময়, সুখময়, সুষমাময় অপরূপ দিব্য উন্নয়ন লাভ করিবে। প্রকৃত নাম-সাধকদের ইহা প্রত্যক্ষ-করা সত্য। ইহাতে তর্কের অবসর নাই।

শয়নকালে খুব করিয়া নাম করার অভ্যাস বড়ই ভাল। তবে স্বাভাবিক নিদ্রার বিঘ্ন করিয়া ইহা অতি দীর্ঘকাল না করাই সঙ্গত। স্বভাবের নিয়ম এবং প্রকৃতির দাবীর সহিত সঙ্গত রাখিয়া কাজ করিতে হইবে, নতুবা "যোগো ভবতি দুঃখহা" কথাটা মাঠে মারা যাইবে। শয়নকালে নামাভ্যাসে সারাদিনের মনের তিক্ততা কমিয়া যায়, অতএব স্বল্প নিদ্রায়ও শরীরের তথা মস্তিষ্কের অধিক বিশ্রাম ঘটে। প্রগাঢ় নিদ্রার একমাত্র উপায় নিশ্চিন্ত-নিদ্রা। ঈশ্বরে পরম নির্ভর আসিলে মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া যায়।

শয়নকালে প্রত্যহ সমগ্র দিনের কার্য্যাবলির ভালমন্দ চিন্তা করিয়া একটা হিসাব নেওয়া উচিত। নতুবা মানুষ পশুত্বের স্তর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। অবিরাম দুরন্ত কর্ম্ম ও চূড়ান্ত

শ্রমে ব্যস্ত-বিব্রত মানুষ মনের অনুশীলনের দিক দিয়া সত্যই বড় কাঙ্গাল থাকে। তার পক্ষে শয়নের পূর্ব্বে সমগ্র দিনের কৃতকর্ম্মের হিসাব নিবার সময়ে নিজের ভিতরের দীর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তিটা নিজের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। অমুককে আজ অতটা রুক্ষ ব্যবহার না করিলেও হইত, শুধু সামান্য আত্ম-সংযম ক্ষমতার অভাবে এই ক্রটিটুকু হইয়া গেল। অমুককে অতটা আদর না দেখাইলেও চলিত, —যদিও যে আদরটুকু দেখান হইয়াছে, তাহা লোকনিন্দায় আসে না বা কামের পর্য্যায়ে পড়ে না। কিন্তু আর একটুখানি বেসামাল হইলে তাহা কামকলঙ্কে কলঙ্কিত হইত। ঠকাইতে চাহি নাই, তবু অমুক লোকটা আমার সংস্পর্শে আসিয়া ঠকিয়া গিয়াছে, আমি আর একটুকু ন্যায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইলে তাহাকে ঠকিতে হইত না এবং আমাকেও ঠগবাজে পরিণত হইতে হইত না। অমুককে তাহার বিপদে দয়া করিতে পারি নাই, আশ্রয় দিতে পারি নাই, তাহার দিকে সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করিতে পারি নাই, ইহা দুঃখের বিষয় হইলেও দোষের বিষয় নহে। কারণ, আমার ক্ষমতা আর কতটুকু, কিন্তু তাহাকে রুক্ষভাবে বিদায় দেওয়া আমার অসমীচীন হইয়াছে। অমুককে কদাচ আমি সাহায্য করিতে পারিব না বা নৈতিক কারণে সাহায্য করিব না কিন্তু তাহার সহিত কথার মারপ্যাঁচ চালাইয়া তাহাকে মিছামিছি প্রলুব্ধ করা আমার অন্যায় হইয়াছে।—এই ভাবে প্রত্যহ শয়নকালে নিজের সমগ্র দিবসের কার্য্যাবলি চিন্তা করিতে থাকিলে তাহার দ্বারা আত্মপরীক্ষা হয়

এবং ক্রমশঃ আত্মসংশোধনের চেষ্টা ও রুচি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু নিজের দোষগুলি নিজের কাছে এই ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবার ফলে অন্তরে লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ এবং আত্মগ্লানিরও সৃষ্টি হয়। এই গ্লানিটুকু নিয়া নিদ্রাগত হইলে সুনিদ্রা হইতে পারে না।

এই জন্য আত্মনিরীক্ষার পরে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শক্তিদানের জন্য আকুল আবেদন জানাইতে হয়। তারপরে শুরু কর নামজপ।

কাম আর প্রেম একই জিনিষের দুইটী পিঠ। কাম তুচ্ছতামুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। প্রেম-চর্চ্চা করিতে গিয়া কামের ক্রীড়ণক হইয়া পড়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। কাম-চর্চ্চা করিতে গিয়া কেহ কেহ প্রেমিক হইয়া যায় নাই, তাহাও নহে। তবে শেষোক্ত পন্থাটী বিপজ্জনক, সন্দেহসঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ। তোমরা প্রেমকে উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক অমলিন রাখিবার চেষ্টা করিও। প্রেম যেন আসক্তির মূর্ত্তি ধরিতে না পারে। প্রেমকে একেবারে নিকষিত হেম থাকিতে দিও। তাহার উপায় নিরন্তর ভগবন্নাম। নাম প্রেমকে উপজাত করে, প্রবর্দ্ধিত করে, নিষ্কাম ও পরিশোধিত করে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় রসের আস্বাদন নামের রসের মধ্য দিয়া করিয়া যাইবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলেই জরাজীর্ণ দুঃখপূর্ণ পৃথিবী নবরূপে নবরসে নব-আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
মঙ্গলবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ২০ জ্যৈষ্ঠের পত্র পাইলাম। তোমরা ১২ই ফাল্গুন তারিখে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ গ্রামে কীর্ত্তনাঞ্জলি চালাইয়া যাইতেছ এবং প্রতিটি রবিবারের নগরসঙ্কীর্ত্তনে সকলের সর্ব্বশক্তি সর্ব্বোৎসাহ সর্ব্বসুযোগ লাগাইতেছ, এই সংবাদে আমার আনন্দ ধরে না। কে বলে যে সংখ্যায় কম হইলে কাজ করা যায় না? কে বলে যে অল্প লোকে কাজে নামিলে জনসাধারণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, অবহেলা করে? যাহারা এরূপ বলে, তাহারা অনভিজ্ঞ। কাজ করিয়া তাহারা কখনও দেখে নাই এবং এই জন্যই তাহাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাও জন্মে নাই। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছু বলিলে তাহাতে রুষ্ট, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইতে নাই, তাহার অজ্ঞানতাজনিত ভ্রম দূর করিবার জন্য আরও উৎসাহ নিয়া কাজ করিয়া যাইতে হয়। দেখিতেছি, তোমরা তাহাই করিতেছ। ক্ষুদ্র গ্রামকে ক্ষুদ্র মনে করিও না, ক্ষুদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না, ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকেও ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিয়া দিও না। ক্ষুদ্র মানুষটার ভিতরে ব্রহ্ম জাগিলে সে জগতের মহত্তম মানুষটীতে পরিণত হইতে পারে।

সুতরাং ঐ একটী মানুষকেই শক্ত করিয়া ধর, নামের সলিলসিঞ্চনে তাহার দেহমনের সকল কর্দ্দম, সকল মালিন্য, সকল পাপের চিহ্নগুলি দূর করিয়া দিয়া তাহাকে নির্ম্মল ও সুন্দর কর। তারপরে সে নিজের বিক্রমে ব্রহ্ম-স্বরূপের বিকাশ ঘটাইবে। জগতের মহত্তম পুরুষেরা এক এক জন এক একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানেই প্রায়শঃ জন্মিয়াছেন। কেহ ঘোড়ার আস্তাবলে, কেহ কারাগৃহে, কেহ অনাদৃত পল্লীর জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে। ক্ষুদ্র স্থান আর ক্ষুদ্র থাকে না, যখন সেখানে মহাভাবের চর্চ্চা হয়। জগতের বৃহত্তম আন্দোলন ও ঘটনানিচয়ের জন্ম হইয়াছে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অতি সাধারণ এক একটা ব্যাপার হইতে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পল্লীগ্রামটীতে প্রতি গৃহে কীর্ত্তনের আনন্দ প্রবহমান রাখিবার জন্য প্রতিদিন ধরিয়াই যেকাজ চালু রাখিতেছ, তাহা আর রুদ্ধ হইতে দিও না। একদা আমি তোমাদের গ্রামে আসিবই। আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত তোমরা রণোন্মাদনা নিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে থাক। উদ্যম হউক তোমাদের অশেষ অনবধি, বিক্রম হউক তোমাদের অপ্রতিহত, লক্ষ্য থাকুক তোমাদের সুস্থির।

আমার সন্তানের কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ,—সে কদাচ অপরের অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না, অন্য ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথের নিন্দা করিবে না, জাতি, বর্ণ, সমাজ, ধর্ম্ম বা দেশের পার্থক্যের দরুণ কাহাকেও দ্বেষ করিবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ,—সে আত্মনির্ভর হইয়া কাজ করিবে, অপরে সহায়তা করিল না বলিয়া কাজে ঢিলা

দিয়া বসিয়া থাকিবে না, আপন হাতকে সে জগন্নাথ বলিয়া বিবেচনা করিবে। তৃতীয় লক্ষণ,— পার্থিব বা অপার্থিব, যে কাজ যখন সে করুক, একাকী তাহার নিজের কল্যাণ, নিজের স্বার্থ, নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধি বা নিজের মুক্তিই সে চাহিবে না, সে সঙ্গে সঙ্গে চাহিবে বিশ্বের কল্যাণ, বিশ্বের স্বার্থ, বিশ্বের অভীষ্ট-সিদ্ধি এবং বিশ্বের মুক্তি। চতুর্থ লক্ষণ,—সে জীবনের প্রতিপদবিক্ষেপে ব্রহ্মচর্য্যকে তার জীবনে যতটুকু সম্মান, মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন-ভার দিতে পারে, তাহা দিবার চেষ্টা করিয়া যাইবে এবং এই চেষ্টাকে সে বিজ্ঞাপন দিয়া বাহিরে জাহির করিবে না, বাহিরের লোকের কাছে নিজেকে একজন ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ সংযত মানুষ বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টায় নামিবে না, মহত্ত্বের ভাণ করিবে না। পঞ্চম লক্ষণ বা চূড়ান্ত লক্ষণ এই যে, কর্ত্তব্য সম্পাদনের পথে বিন্ধ্যগিরিতুল্য বা হিমাচলমিত বাধা আসিলেও সে গ্রাহ্য করিবে না।

তোমরা তোমাদের জীবনকে এই লক্ষণগুলির সহিত মিলাইয়া পরিচালিত করিবার চেষ্টা কর। তাহা হইলেই আমি একদা বহু কৃতী সন্তানের পিতা বলিয়া শ্লাঘা অর্জ্জন করিতে পারিব।

বাড়ীর পর বাড়ী প্রাণ ভরিয়া নাম করিয়া যাইতেছ, একটী দিনও যাহাতে বাদ না পড়ে, সেই দিকে সকলেরই তীব্র দৃষ্টি, এই সংবাদ শুনিয়া তোমাদের প্রতিজনকে বুকে ধরিয়া আনন্দ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তোমাদের প্রত্যেকটী অভিযান সফল হইতেছে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেন না এদেশ মহাপ্রেমিক

মহাভাবুক মহাজ্ঞানী মহামহর্ষিদের দেশ। তাঁহাদের পূত পদরেণুর মহিমা যাইবে কোথায়? নামের আনন্দে বিশ্ব ভুলিয়া তাঁহারা একদা যে গভীর সমাধিতে ডুবিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে বিশ্বকুশল-বীজ নিহিত আছে।

নিজেদের সংঘানুবর্ত্তীর সংখ্যাবর্দ্ধনে আগ্রহী পুরুষদের প্রচারধারা এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মত ও মন্তব্য সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছ, তাহার উপরে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়া কেহ যদি নিতান্ত বালকোচিত তত্ত্বও অবিরাম শুধু মানুষের কাণে প্রবেশ করাইতে থাকে, তাহা হইলে উহার ফলে জগতের অনেক সরলপ্রাণ ব্যক্তি ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং তদনুবর্ত্তী মতকে শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা বলিয়া গ্রহণ করে। যাহারা তাহা করিবে, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার অধ্যবসায়ে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও এবং নিজের চরকার সূতা যাহাতে নিকৃষ্ট বা অল্প না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দাও।

নিজের গুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিবার রীতিটা এদেশের বহুকালের একটী প্রাচীন শৈলী। সম্ভবত পৌরাণিক যুগ হইতেই এই শৈলী কম-বেশী চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক মনোভাব-সম্পন্ন এক তেজস্বী ধর্ম্মগুরুকেও ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর আগে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, অবতার-বাদের সাহায্য নিলে সঙ্ঘের প্রসার দ্রুত হয়, ধর্ম্মের প্রচারে ব্যাপকতা সহজে বাড়ে। অতএব অত্যাধুনিক কালের কেহ কেহ নিজেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচার করিতে বা প্রচারিত করাইতে প্রলুব্ধ হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য

ঘটনা কিছু নহে। একবার নিজেকে অবতার বলিবার পরে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতাররূপে পূজিত মহাপুরুষদের সহিত নিজের অভিন্নতা স্থাপনের প্রয়োজন আপনা আপনি আসিয়া যায়। সুতরাং এই উক্তিও খুব অপ্রাসঙ্গিক হয় না যে, ইনি ঠিক আগের জন্মটাতে শ্রীরামকৃষ্ণদের ছিলেন। কেহ ত' আর কুষ্ঠী-ঠিকুজী নিয়া বসিবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখিলেন কোন্ সনের কত তারিখে আর ইনি ভূমিষ্ঠ হইলেন কোন্ সনের কত তারিখে।আবার আরও মজা এই যে, ইনি যখন একদা রামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ইহারও পূর্ব্বে প্রায় পাঁচশত সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্ব্বেকার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-রূপেও ত' ইনিই আসিয়াছিলেন। তবে ত' শ্রীকৃষ্ণরূপে ইনিই আসিয়া দ্বাপরের যমুনাকূলে মোহনবংশী বাজাইয়াছিলেন। তবে ত' ইনিই সীতা-হরণকারীকে দণ্ডদানের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সোণার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। তবে প্রশ্ন আসে, রামকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ এই দুই আবির্ভাবের মাঝামাঝি সময়টায় ইনি কোথায় ছিলেন? এই ইনি, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ভাবিতেছেন, এই দেহটা লয় পাইবার পরে তিনি কোথায় যাইবেন, কি ভাবে থাকিবেন, কি কি লীলা করিবেন? কল্কিরূপে তাঁহার আবির্ভাবের নাকি কথা ছিল, যাঁহার মূর্ত্তি রণোন্মাদবিলসিত, দুর্ব্বার বিক্রমের লাস্যলীলায় উচ্ছলিত, নিপাত ও নিধনে যাহার অপার তৃপ্তি, অগাধ আনন্দ, যিনি পৃথিবীতে মিথ্যার রাজত্ব, ভণ্ডামির প্রভুত্ব, ভানের প্রেতভাণ্ডব থাকিতে দিবেন না।

এমন অপূর্ব্ব পৌরুষদীপ্ত আবির্ভাবের আশাপ্রদ ভূমিকা কি সত্যই কোথায়ও দেখা যাইতেছে?

মানুষের মনের এই সকল প্রশ্নকে কেহ আটক করিয়া রাখিতে পারে না, পারিবে না। তবু একদল নিরীহ ভক্ত এই সকল প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া এক একটা বিশেষ বিশেষ পথে নিজের সাধনরুচির পরিতৃপ্তি বিধানের চেষ্টা করিবে। তোমরা তাহাদের পথের কণ্টক হইও না।

তোমরা সবাই জানিয়া রাখ যে, আমি একটী সাধারণ মানুষ, অলৌকিকত্ব আমাতে কিছুই নাই। আমি ভেড়ার পাল চরাইবার জন্য আসি নাই। সাধারণ মানুষের সহিত সাধারণ ভাবে মিলিতে, চলিতে, থাকিতে আসিয়াছি। আমার গৌরবের পরিচয় এই যে, আমি তোমাদের আপনার জন। তোমাদিগকে মুক্তিদান বা উদ্ধার করা আমার প্রয়োজন নহে। তোমাদিগকে নিখিল বিশ্বের আপন করা এবং নিখিল বিশ্বকে তোমাদের আপন করাই আমার প্রয়োজন। আমাকে মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, পুরুষোত্তম, অবতার বা পরমেশ্বর বলিয়া তোমরা প্রচার করিও না। যেদিন তোমরা প্রতিজনে নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বরকে অবতীর্ণ দেখিতে পাইবে, সেদিন আমিও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবতার হইব। তাহার আগে নহে।

সত্যই হরিওঁ নাম এক অপূর্ব্বমধুর নাম। কে যে কবে আমার কাণে এই মধু ঢালিয়া গিয়াছিলেন, আমার স্মরণ নাই। এই নামটীর জন্য আমি কাহার কাছে ঋণী, যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার চরণ আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়া ধোয়াইয়া তবে

তৃপ্তি পাইতাম। প্রাণ ভরিয়া তোমরা নামকীর্ত্তন করিয়া যাও। এই একটী নাম দিয়া বিশ্বের কোটি নামের সমন্বয় সাধন কর। এই একটী নামেই তোমরা বিশ্বের সকলের হৃদয় হইতে হিংসা দূর করিবে। "হরি" মানে "পরমেশ্বর", "ওঁ" মানে "আছেন", "হরিওঁ" মানে "তিনি আছেন, তিনি সত্য, তিনি নাই বলিয়া অশান্ত অধীর হওয়া ভুল।"

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার অনেক পত্রই হয়ত পাইতেছ না। পথেই মারা যাইতেছে এবং অনেক দূরে মারা যাইতেছে না, তোমার ঘরের কাছে ডাকঘরটীতেই হয়ত পত্রটী মৃত্যুর কবলে পড়িতেছে। তবু পত্র লিখিতে হয়। তবু আমাকে বারংবার বলিতে হয় যে, সাহসীরাই আমার স্নেহ পায়, কাপুরুষেরা নহে। ভয়রহিত হইয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও, তারপরে কর ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা, যাহা না চাহিলেও তিনি সাহসীকে সর্ব্বদাই দিয়া আসিতেছেন।

হতাশ বিরস মনে শয্যাতলে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিয়া যাহারা ভগবানের সাহায্য চাহে, ভগবান সাহায্য আগাইয়া দিলেও, উহা তাহাদের হাতে গিয়া পৌছে না, অন্যত্র চলিয়া যায় এবং অন্যেরা নিজেদের পৌরুষের পুরস্কার-স্বরূপ তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হয়।

যেখানে অভীষ্ট-সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই বরং অনেক অকল্পনীয় বিপনেরই সম্ভাবনা বেশী, সেখানেও সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার নাম দুঃসাহস। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে এই দুঃসাহসের নাম-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তখন ইহার নাম সৎসাহস। সাহসী লোকও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়াই কাজ করিবে কিন্তু তুমি যদি সত্যেরই ধ্বজা ধরিয়া থাক, তবে মৃত্যুকেও অকাতরে বরণ করিতে তুমি পারিবে। মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করিও না, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে।

ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য অপেক্ষা দেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম ও পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য মহত্তর জানিও। দুই কর্ত্তব্যে দ্বন্দ্ব আসিলে বিচার করিবে, কোন্‌টীতে জগদ্বাসীর অধিকতর কল্যাণ। আশ্রমবাসীদের জীবনে জগৎকল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনও স্বপ্ন থাকা উচিত নহে, যদিও আমার মতে মানুষ মাত্রেরই জগৎকল্যাণকারী হওয়া উচিত।

যুদ্ধ করিয়াই সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। যুদ্ধকে ভয় করিও না। যুদ্ধে জয়ও আছে, পরাজয়ও আছে। জয়লাভই তোমাকে করিতে হইবে। কিন্তু পরাজয়কেও ভয় পাইও না।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কখনো পরাজয় যদি ঘটে, তবে তাহাকে ভাবী জয়ের সহায়ক রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। যে লাগিয়া থাকে, সে মাগিয়া খায় না। একবার পরাজিত হইতে পার, দুইবার পরাজিত হইতে পার কিন্তু পরাজয়কে চূড়ান্ত কথা বলিয়া মানিয়া লইতে পার না। কোষ্ঠীতে তোমার যাহাই লেখা থাকুক, তাহা উল্‌টাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা বিধাতা তোমাকে দিয়াছেন।

আমি যুদ্ধবাজ সাধু নহি, আমি শান্তিবাদী পুরুষ। কিন্তু যুদ্ধ আসিয়া ঘড়ে পড়িলে পুথিগত নীতিশাস্ত্রে দোহাই দিয়া পলায়নের কৌশল খুঁজিবার রুচি আমার নাই। শান্তির যদি সত্যই অন্য পথ না থাকে, তবে যুদ্ধই করিব এবং সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শরীর দিয়া পাপ করিবে না, ইহাই বড় কথা নহে, মন দিয়াই বা পাপ করিবে কেন?

জাগ্রতে পাপ করিবে না, ইহাও বড় কথা নহে, স্বপ্নেই বা পাপ করিবে কেন? স্বেচ্ছায় পাপ করিবে না, ইহাই বড় কথা নহে, অনিচ্ছায়ই বা পাপ করিবে কেন? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অপরের চাপে বা প্ররোচনায় অরুচিপ্রদ পাপ করিতে করিতে কিছুকাল পরে সেই পাপ বড়ই রুচিপ্রদ, বড়ই তৃপ্তিজনক মনে হয়। স্বপ্নে পাপ করিতে করিতে সেই পাপকে জাগ্রত করিতে আর তেমন বাঁধে না, ক্রমে তাহা অভ্যাসের সামিল হইয়া যায় এবং জীবনের উপরে শক্ত শিকড় গাড়িয়া বসে। মন দিয়া পাপ করিতে করিতে হঠাৎ একদা দেহের আগল খুলিয়া যায়, লাজের বাঁধন খসিয়া পড়ে, কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব একেবারে নাশ পায় এবং যাহা কদাচ তোমার দ্বারা সম্ভব ছিল না, এমন অভাবনীয় কদর্য্য ব্যাপারে দেহ একেবারে সর্ব্বশক্তি দিয়া মজিয়া যায়।

সুতরাং ক্ষুদ্র একটা স্বপ্ন দেখিলেও তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, যেন স্বপ্নে দৃষ্ট ইন্দ্রিয়লৌল্য না আবার জাগ্রতে রূপ নিতে পারে। মনের তুচ্ছ একটা বিলাস-তরঙ্গ দেখিলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হইতে হইবে যেন মনের আবেগ দেহকে না অভিভূত করিয়া অনভিপ্রেত পথে তোমাকে চালিত করিতে পারে। কেহ জোর করিয়া, কৌশল খাটাইয়া, প্রলোভনের জাল পাতিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়া অন্যায় কিছু করাইতে চাহিলে তখনি তোমার বিদ্রোহী শির উন্নত করিতে হইবে এবং বজ্রকণ্ঠে বলিতে হইবে "করিব না।"

কিন্তু আসল প্রতীকারের মূল সূত্রটী তোমার মনের মধ্যে রহিয়াছে। কত অবচেতন বাসনা, কত অপূর্ণ কামনা, কত অতৃপ্ত প্রার্থনা মনের গায়ে অতি গোপনে কোন্ সুদূর অতীত হইতে জোঁকের মতন সন্তর্পণে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহা তুমি জান না। তোমাকে নাম-সাধন রূপ চূণের জল দিয়া সেই জোঁক ছাড়াইতে হইবে। অবিরাম নিষ্কিঞ্চন-প্রাণে একান্ত শরণাগতি লইয়া নাম-সাধন করিতে করিতে তোমার মনের অবচেতন সত্তার দিব্য রূপায়ণ ঘটিবে, অনেক পূর্ব্বসংস্কার একেবারে লোপ পাইবে, অনেকগুলি সংস্কার এমন বিচিত্র এক দেবভাবপূর্ণ রূপান্তর পাইবে, যাহাতে জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে তোমার অশেষ সহায়তা হইবে।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবানের নাম-সাধনে লগ্ন হও। নাম-সেবার অপার মহিমায় তুমি বিগতকাম, বিগতমোহ, বিগতমল হইয়া দিব্যকান্তি কন্দর্পস্বরূপ হইবে এবং কন্দর্পদেবের তূণীর এবং শররাজি তোমার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামে বিশ্বাস কর এবং তাহার মধ্য দিয়া নিজেকে নিরন্তর প্রেমরসে ডুবাও। প্রেম আসিলে কাম থাকিবে না। প্রেম জাগিলে ঘুমের ঘোরেও কাম তোমাকে স্বপ্ন রূপে বিরক্ত করিতে সাহস করিবে না। নামই জীবনের পরমরসায়ন, নামই জীবনের অমোঘ অমৃত। নামে বিশ্বাস কর, নামে নিষ্ঠা রাখ, নাম করিতে করিতে নামময় হইয়া যাও। নামময়

হওয়া আর প্রেমময় হওয়া একই কথা জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা তোমাদের কর্ম্মের দ্বারা ইতিহাস লিখিতে যাইতেছ। তোমরা ক্ষুদ্র একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস লিখিতে যাইতেছ না, তোমরা লিখিতে যাইতেছ পৃথিবীর নূতন ইতিহাস। Localism বা স্থানিকতার মোহ তোমরা পরিত্যাগ কর। প্রত্যেকেরই কতকগুলি স্থানীয় কর্ত্তব্য থাকে কিন্তু সেই কর্ত্তব্যগুলিকে সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্যের বিরোধী করিয়া পালন করা সঙ্গত নহে। স্থানিকতা-দোষ তোমরা পরিহার কর। একটা নির্দ্দিষ্ট গ্রাম বা সহরে সৎকার্য্য হইলে তবেই তোমরা সহযোগ করিবে, সেখান হইতে দশ, বিশ, পঞ্চাশ মাইল দূরে কোথাও হইলে নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে, এতজ্জাতীয় সঙ্কীর্ণতা তোমাদের থাকা অন্যায় হইবে।

সকলের মধ্যে অতি দ্রুত কর্ম্মবণ্টন করিয়া দাও। কর্ম্মের

সকল অংশের জন্যই কর্ম্মী চাই, কোথাও কর্ম্মীর হাত খালি থাকিলে চলিবে না।

কাহাকে কি কাজ দেওয়া যায়, প্রশ্ন ইহা নহে। কে কি কাজ হাত বাড়াইয়া নেয়, ইহাই প্রশ্ন। প্রশ্নটী সকলের সম্মুখে ধর।

কাজ কেহ অল্পই করুক, কিন্তু সুন্দর রূপে করুক, সুশৃঙ্খল ভাবে করুক, অন্যের সৎকাজের সহিত বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া করুক, দশজনের অন্তরে প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে করুক। তোমাদের প্রতিজনের কাজ জগতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করুক।

প্রত্যেক কর্ম্মী নিজের গোপন জীবনে এক কণা করিয়াও ব্রহ্মচর্য্যকে পালন করিবার চেষ্টা করুক। বাহিরের ভড়ং আবশ্যক নহে, অন্তরের শুচিতা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য পালনের সামান্য চেষ্টা করিলেও কর্ম্মশক্তি, কর্ম্মোদ্যম, কর্ম্মে অনলসতা তোমাদের দিনের পর দিন বাড়িতে থাকিবে। ব্রহ্মচর্য্যকে কর্ম্মসাধনার মেরুদণ্ড বলিয়া জানিও।

ভগবৎ-সাধন অকপট হইলে ভগবৎকৃপায় আপনা আপনি অন্তরে ব্রহ্মচর্য্যের রুচি আসে এবং বক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনের সাহস জাগে।

নানা আড়ম্বরপূর্ণ পূজাপদ্ধতিরও সমর্থনের কতকগুলি দিক আছে কিন্তু নামসাধনই ভগবানের সহিত লগ্ন থাকিবার সহজতম পথ এবং সর্ব্বাধিক গ্রাহ্য সদুপায়। তোমরা নিজ নিজ জীবনে

নাম-সাধনকে অন্তরঙ্গ সহজ সম্পদে পরিণত কর। নাম-সাধনের ভিতরে যেন কৃত্রিমতা আর ভান না থাকে। যে যত নিবিড়, গভীর, গোপন হিয়ায় নামকে বাঁধিতে পারিবে, সে তত বাহাদুর।

নাম কদাচ ভুলিও না। তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদের কাছে মনে মনে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, তোমার যেন নামে রুচি হয়। তোমার চেয়ে নিকৃষ্টদের জন্য মনে মনে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ কর, তাহাদের যেন মন নামে মজে। পৃথিবীর প্রত্যেকটী প্রাণী নাম-সাধনের আনন্দরস আস্বাদন করিয়া বিগতকল্মষ বিগতদুঃখ হউক। প্রত্যেকের আনন্দ অপর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
শুক্রবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(৭-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার পূর্ব্বলিখিত পত্রখানা কি লোক-মারফৎ পাইয়াছ?

শাক্তেরা লাল ফুল ভালবাসেন, এই জন্যই রক্তজবার এত সমাদর। বৈষ্ণবেরা সাদা ফুল পছন্দ করেন এবং লাল ফুল অপছন্দ

করেন। এই ভালবাসা ও না-বাসার মধ্যে তত্ত্বগত কোনও কারণ থাকিতে পারে। ঐ ঐ সম্প্রদায়ের আচার্য্যরা তাহার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবেন। আমরা শাদা, লাল, হলদে, নীল, জরদ, পাটল, সবুজ, বেগুনী সব রংয়ের ফুল পছন্দ করি। সব ফুলই আমাদিগকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের সার্থকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ফুল সুন্দর বলিয়াই ভগবানের কথা আমাদিগকে স্মরণ করায়, তার রং কি, ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

অনেকে আবার বিলাতি ফুলে দেশী ঠাকুরের পূজা করেন না। কিন্তু গন্ধরাজ চলে। শুনিতেছি, গন্ধরাজ ফুল এদেশের নয়, বিদেশের আমদানী। আমাদের পূজা স্বদেশী বিদেশী সব ফুলে চলে। সুগন্ধ হইলে উত্তম, নির্গন্ধ হইলেও সে তার সুষমা দিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ভাবোদ্দীপক। ফুলটা উপলক্ষ্য, লক্ষ্য দেহমনপ্রাণকে একাগ্র ও অভিনিবিষ্ট করিয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ,—ফুলসহ নিজেরে দিলাম প্রভু তব পদতলে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রচার, সংগঠন বা অন্য কোনও সমাজমঙ্গলকর কাজ যাহাই কর, শক্ত ভিত্তি গড়িতে হইবে ব্রহ্মচর্য্যের উপরে। নিজ জীবনেও ইহার অনুশীলনকে যতটা সম্ভব নিখুঁত রাখিতে চেষ্টা করিবে। আমার যাহারা কর্ম্মী হইবে, তাহারা বিবাহিতই হউক আর অকৃতদারই হউক, ব্রাহ্মচর্য্যকে জীবনের মূল ভিত্তি রূপে ধরিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তোমাদের সমাজ-কর্ম্মে স্বাভাবিক সফলতার সম্ভাবনা তত বাড়িবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভাব-শক্তি বা personal magnetism বাড়ায়, যাহা কারণ তর্ককে স্তব্ধ করিয়া দিয়া নিজ কাজ নিয়া অবহেলে অগ্রসর হইয়া যাইবার সহায়তা করে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য যে ব্যক্তি কারণাধীনে পালন করিতে পারে না, তাহারও ব্রহ্মচর্য্যানুরাগ প্রবল থাকিলে ঐ অনুরাগ হইতেই এক অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি হয়।

যুক্তি দিয়া পৃথিবীর কয়টা লোককে নিজ পথে আনা যায়? প্রভাবশক্তি বা Personal influence-ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীয়সী হইয়া কাজ করে। তোমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাবান হইয়া নিজ নিজ প্রভাব-শক্তিকে অলঙ্ঘনীয় কর। পৃথিবীর অন্যত্র বা ইতিহাসের অন্য যুগে যাহা অস্ত্রবল বা অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, বর্ত্তমান ও ভাবী যুগে তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্মচর্য্যবান্ একাগ্রমনাঃ আদর্শ পুরুষদের প্রভাবশক্তিতে সম্পন্ন হইতে পারে এবং পারিবে।

নিছক একাকী নিজের বলে ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখা সম্ভব নহে। এজন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। সেই অনুকূল পরিবেশ আবার তোমাদেরই নিজ চেষ্টায় গড়িয়া নিতে হইবে। এখানেই প্রচারের অধিকার আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিবার জন্য পরমেশ্বরে আত্মনিবেদনও চাই। এজন্যই তোমাদের দৈনন্দিন উপাসনাটিতে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে। দীক্ষা এই জন্যই নিয়াছ যে প্রত্যহ উপাসনা করিবেই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদিগকে দীক্ষাদানের কালে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছি যে, উপাসনার যে পদ্ধতি পাইলে, সেই অনুযায়ী প্রত্যহ উপাসনা করিতে হইবে। সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে হইবে বলিয়া ইহা বুঝিও না যে, তোমাদের দৈনিক একান্ত একক উপাসনাটী বাদ দিবে। একক উপাসনা প্রত্যহই করিবে এবং সম্ভব হইলে চারিবার করিবে। ঐ নির্দ্দিষ্ট বারের সম-সময়ে যদি কোথাও

সমবেত উপাসনাতে যোগদান কর, তবে ঐ সময়ে আর আলাদা করিয়া একক উপাসনাটী করিতে হইবে না। সমবেত উপাসনা সকলকে লইয়া উপাসনা। তাহা যদি ঠিক ঠিক বিধান অনুযায়ী হয়, তবে তাহাতে অপার আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু তাহা সপ্তাহে একটী মাত্র দিন। বিশেষ বিশেষ কারণে মণ্ডলী ব্যতীত অন্যান্যের গৃহে সমবেত উপাসনা হইলে সাপ্তাহিক নির্দ্দিষ্ট সমবেত উপাসনায় যোগদানের অতিরিক্ত ইহাতেও শক্তি-সাধ্যানুযায়ী যোগদানের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে একদিন মণ্ডলীতে অন্য ছয় দিন ছয় জন আলাদা আলাদা ব্যক্তির বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইতে গেলে রোজই তুমি সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে হয়ত পারিয়া উঠিবে না। ইচ্ছা থাকিলেও ইহা সম্ভব নহে। আর, সম্ভব হইলেও ইহার প্রত্যেকটাতে যোগদান করা বাধ্যকর নহে।

মনে রাখিও, একাকী প্রত্যহ নিজে যে উপাসনাটী করিবে, তাহা তোমার সঙ্গে পরমেশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। এই সম্বন্ধ ভক্তির গভীরতা অনুসারে এক এক জনের এক এক প্রকারের। এই সম্বন্ধটী প্রত্যহ ভগবানের সহিত নিভৃতে একাকী বসিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা তোমার একান্তই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত একক উপাসনাটী তুমি কোনও কারণেই বাদ দিতে পার না। আমি তোমাদিগকে সমবেত উপাসনা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি বলিয়াই তোমরা কেহ নিজেদের ব্যক্তিগত উপাসনায় অবহেলা করিও না।

কেহ কেহ বলিতেছে, "আপনি আমাদিগকে কীর্ত্তন করিতেও ত' বলিয়াছেন। কীর্ত্তন আমাদের খুব ভাল লাগে। সুতরাং আমরা প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেবল কীর্ত্তনই করিব, ব্যক্তিগত উপাসনা করিব না।" এইরূপ বলা বা করা অন্যায়। তোমাদের সাধন-জীবনে কীর্ত্তনেরও একটা স্থান আছে, সমবেত উপাসনারও একটা স্থান আছে, ব্রহ্মগায়ত্রী জপের কালে ধ্যানেরও একটা স্থান আছে, তোমাদের উপাসনাটী নানারূপ প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার একটী কল্পলতিকা বিশেষ। আলাদা ভাবে সুদীর্ঘ কীর্ত্তন, আলাদা ভাবে সুদীর্ঘ জপ, আলাদা ভাবে সুদীর্ঘ ধ্যান, আলাদা ভাবে সুদীর্ঘ পাঠ প্রভৃতি তুমি সুযোগ, সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী করিতে পার এবং করিবে কিন্তু তোমার নিয়মিত দৈনিক উপাসনাটীকে তুমি অবহেলা করিও না।

আমি তোমাদিগকে দৈনিক চারিবার ব্যক্তিগত একক উপাসনা করিতে বলিয়াছি কিন্তু তোমরা তাহাতে কষ্ট বোধ কর। কিন্তু হজরত মহম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে রোজ পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িতে বলিয়াছেন। তাঁহারা সে আদেশ অবনতশিরে পালন করে। আমি আশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধারমণীকে দৈনিক পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি। পঙ্গু, দুর্ব্বল, বাতব্যাধিগ্রস্ত মুসলমানও প্রাণপণ করিয়া ঐ পাঁচবার নমাজ পড়িবেনই পড়িবেন। তাঁহাদের গুরুবাক্যে নিষ্ঠা আছে তাই তাঁহাদের পক্ষে একাজ শক্ত হয় না। বল ত' দেখি মা, চারিবার দৈনিক উপাসনায় বসা তোমাদের পক্ষে কেন কষ্টকর হইবে!

আমি এই বিধানও দিয়াছি—বেশ, ত', দুইবার সংক্ষেপে কাজ সার, দুইবার প্রাণ ভরিয়া কর। যাঁহাকে ছাড়া ইহকালে পরকালে কোনো কালেই তোমার চলিবে না, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা দিনে অন্ততঃ দুইবার ভাল করিয়া কর। ঐ দুইটী বার নাম করিতে করিতে একেবারে বুঁদ হইয়া যাও। বাকী দুইবার বস আর ওঠ অর্থাৎ নিয়ম রক্ষা কর।

দীক্ষা নিবে কিন্তু সাধন করিবে না, এ কি রকমের শিষ্যত্ব মা তোমাদের? সংসারের হাজার আবল্যের মধ্যেও তোমার দৈনিক ব্যক্তিগত সাধনার সময়টুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লওয়া তোমারই অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দের জন্য প্রয়োজন। ইহার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভ কি আছে মা? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ বা অন্য যাঁহারই যিনি ভক্ত হউন, সকলকে সম্মান করিবে। পৃথিবীর সকল লোক তোমার গুরুভাই নাও হইতে পারেন। এই স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে।

পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সকলকে মধুর উপদেশে এবং সদ্ব্যবহারে বশ করিবে। এই যুগে অতিরিক্ত শাসন কোনও সুফল দেয় না।

স্ত্রীকে সন্দেহ করার মতন বোকামি কিছুই নাই। কেহ সত্যই দোষী হইলে তাহাকে সন্দেহ দ্বারা সংশোধিত করা যায় না, যায় অকপট প্রেমের দ্বারা। সন্দেহের বড় জ্বালা। সন্দেহ পরিহার কর।

স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসা তোমাকে পরমেশ্বরের দিকে ঠেলিয়া দিক, এ ভালবাসা যেন তোমাকে অন্ধকূপে না হত্যা করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দম্পতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী অথচ ব্রহ্মচর্য্যেরও প্রতিষ্ঠা দরকার। উপায় কি? নিজেদিগকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দেওয়া। দুই জনেই প্রাণপণে ভাবিতে থাক, "এই দেহ ভগবানের, আমার নহে।" মিলিত অবস্থায় এবং বিযুক্ত অবস্থায় সর্ব্ব অবস্থায় এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সত্যই একদা দেহ দুইটা পূরাপূরি শ্রীভগবানের

হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে, কোনও অবস্থাতেই দেহে আর চাঞ্চল্য আসে না।

কিন্তু দেহের রাজা মন। সুতরাং নিয়ত মন দুইটাকেও ভগবানের হাতে এভাবে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে থাকিবে। চেষ্টা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ সফল হইয়া যাইব।

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কার্ডখানা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম।

সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে পার্থক্য ত' তাহাদের ত্যাগের সামর্থ্যের মধ্য দিয়া। যে যত ত্যাগী, সে তত বড়। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা প্রতিজনে ত্যাগী হও অর্থাৎ বড় হও।

আনন্দজনক সংবাদ শুনিয়া উল্লসিত হইবে, ইহাই ত' স্বাভাবিক কিন্তু উল্লাসকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে অল্প সময়ে অনেক কাজ হইয়া যাইবে। ট্রেণে যাইবার পথে পাঁচ সাত মিনিটের জন্য আমাকে পাইয়া কোথাও কোথাও

এমন হৈ-চৈ সুরু হইয়া গিয়াছে যে, শেষে চেইন টানিয়া ট্রেণ থামাইতে হইয়াছে। অথচ যেখানে শৃঙ্খলা আছে, তেমন স্থানে আমি দুই মিনিট দিয়াছি প্রণাম করিতে, দুই মিনিট বিলাইয়াছি প্রসাদ, আর বাকী চারি মিনিট দিব্যি একটী ভাষণ দিয়া নিশ্চিন্তে গাড়ীতে চাপিবার পরে গাড়ী ছাড়িয়াছে। তোমরা প্রতিকার্য্যে শৃঙ্খলা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর। দেখিবে, কত অল্প সময়ে আর কত অল্প আয়াসে কত বেশী কাজ করিতে পার।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমি রণক্ষেত্রের একজন কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক, সাধু আমি নহি। আমি যদি তোমাদিগকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পাই, তাহা হইলে অল্প লোক দিয়াও যে-কোনও স্থানে অঘটন ঘটাইতে পারি। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনও সেনানায়ক তাঁহার রণ-কৌশল সফল করিতে পারেন নাই। প্রতিকার্য্যে তোমরা শৃঙ্খলার অনুশীলন কর।

যাহা কিছু করিলে মানুষের মনের পবিত্রতা বাড়ে, তাহাই জনহিত, তাহাই দেশসেবা, তাহাই পুণ্য কাজ। সমাজের মন হইতে কলুষ-পল্বল দূর করিবার দায়িত্ব তোমার আমার সকলের সমান। কেহই আমরা এই দায়িত্ব হইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিতে পারি না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কাজেই জীবন একেবারে না নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস লইয়া কেহ একা কাজে নামিলেও তাহার শুভফল আছে কিন্তু বহুজনে সমমনাঃ, সমপ্রাণ, সমচিত্ত, সমহৃদয়, সমলক্ষ্য ও সমযত্ন হইয়া যুগপৎ কাজে নামিলে তাহার ফল অধিকতর

ব্যাপক হয়, গভীরতর হয় ও স্থায়িতর হয়। তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের সহরটী একবার চষিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। প্রথম বারে বিফল হইতে পার, দ্বিতীয় বারেও পার কিন্তু প্রত্যেক বারই বিফল হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। সফলতাই যাহার দৃঢ় লক্ষ্য, বিফলতা ক্রমশই তাহার কাছ হইতে ভয়ে পলাইতে সুরু করে। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, তোমরা দৃঢ়ব্রত হও, তোমরা অপরাজেয় পৌরুষ নিয়া কাজে নামো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * আমাকে, আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে বুঝিবার জন্য আমার পুত্রকন্যাদের মধ্যে কোনও ব্যাকুলতা বা আগ্রহ জাগ্রত হইতেছে না, এজন্য আমি দুঃখিত নহি। কারণ, অনন্তকাল ধরিয়া মানবজাতি আমাকে বুঝিবার সাধনা করিবে। সেজন্য শুধু আমার দেহান্তটুকু হওয়া প্রয়োজন। ততদিন আমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, বিধির বিধানে আপনা আপনি

বিনা চেষ্টায় এতবড় একটা সঙ্ঘ জগতে কুত্রাপি কদাচ স্থাপিত হয় নাই, অথচ এই সংঘের অন্তর্ভুক্তেরা কেহ কাজ করিতে নামিল না। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধি দিয়া, বিদ্বানেরা বিদ্যা দিয়া, ধনবানেরা ধন দিয়া, শক্তিমানেরা শারীরিক সামর্থ্য দিয়া এবং নিষ্কিঞ্চনেরা শুধু মাত্র ভক্তি দিয়া কাজ করিতে পারে। কেন তাহারা কাজ করিবে না? যে যাহা পারে, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(৮-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ বী—র মুখে তোমাদের গ্রামের কাজকর্ম্মের পূর্ণ বিবরণ পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। অবশ্য, সপ্তাহখানেক আগে শ্রীমান নি—র পত্রে সমস্ত বিবরণই জানিয়াছি।

জেলা সহর, জাঁকালো সহর। চারিলক্ষ লোকের সেখানে বাস। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে গিয়া একদা আমি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র মানুষের মনে প্রকৃত ও উন্নত

আদর্শবাদের বাণী ঢালিয়া আসিয়াছি। এক দিন নহে, দুই দিন নহে, ছয় ছয়টা অপরাহ্নে জনাকীর্ণ জনসভায় আমার রুদ্র কণ্ঠ ভারতীয় আদর্শের বাণী মানুষকে শুনাইয়াছে। শুধু দল বাঁধিয়া আসিয়াই মানুষেরা তাহা শোনেন নাই, শুনিবার আগ্রহে জনসাধারণের রাস্তা জাম্ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকের গাছের ডালে ডালে মানুষ উৎকর্ণ হইয়া ঝুলিয়াছে। তাহারও পরে ছয় বৎসর পূর্ব্বে আর একবার গিয়াছিলাম এবং কম পক্ষে তিনটী ভাষণ দিয়াছিলাম বিরাট আর এক জনাকীর্ণ মাঠে। জেলার অধিকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি হইতে সুরু করিয়া সহরের এমন কোনও শ্রেণীর লোক ছিলেন না, যাঁহারা সে সভাগুলিতে উৎকর্ণ হইয়া দৈনিক তিনটী ঘণ্টা করিয়া বসিয়া যান নাই। অশীতিপর বৃদ্ধ ও প্রবীণ মহাপণ্ডিতেরা আসিয়া গদ্‌দদ্ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"আপনার চৌত্রিশ বৎসর আগের কণ্ঠ আজও অবিকৃত আছে!"

কিন্তু হায়, এমন সুন্দর তৈরী ক্ষেত্রের সদ্ব্যবহার হইল না। তাহাতে ঝগড়া-কলহের আগাছা জন্মিতে দেওয়া হইল। তাহাতে অপ্রীতির বিষলতার বীজ বপন করা হইল। কে নেতা, কে সভাপতি, কে সম্পাদক, কে আজ্ঞাবহ ভৃত্য, এই সকল অবান্তর অনাহূত তত্ত্বের আমদানী করা হইল। কাজ না করিয়া যশোলাভের, যশ লাভ করিয়া কাজ না করিবার নিদারুণ প্রতিযোগিতা চলিল। তোমাদের গ্রামের শ্রীমান নি— ছুটিয়া গেল জেলা সদরের উত্তপ্ত আবহাওয়া ঠাণ্ডা করিতে।

তিনটা বৎসর সে খাটিল। এই বুঝি সুফল পাওয়া গেল, এই বুঝি অবসন্নদের উৎসাহ জাগিল, এই বুঝি আড়াআড়ি ভাব দূর হইয়া গেল, এই বুঝি ঐক্য আসিল! প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় সে নিজের গ্রামের কাজের কথা ভুলিয়া গিয়া জেলা-সদরে অকাতরে শ্রম দিতে লাগিল।

একটা ঘটনায় তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে তাহার গভীর বেদনা, অন্তরে তার অপার হতাশা। আমি বলিলাম,—"বাছা রে, নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া অন্য জায়গায় গিয়া যথেষ্ট শ্রম দিয়াছ, কিন্তু বাহির হইতে দুয়ার ঠেলিলেই ভিতরের মানুষ জাগে না, যদি ঘরের ভিতরের মানুষগুলির রক্তমাংসে জাগিবার স্বভাবধর্ম্ম না থাকে। ইহাদিগকে ইহাদের মনে থাকিতে দাও। তুমি এখন নিজের গ্রামে কাজ সুরু কর।"

গ্রামটী তোমাদের রসুলপুর। ছোট্ট গ্রাম। গুরুভাই মাত্র দুই জন আর তিন জন। কিন্তু কাজ করিবার যাহাদের অকপট ইচ্ছা, তাহাদের সংখ্যাল্পতায় আটকায় না। কাজ আরম্ভ হইল। প্রত্যহ তোমরা মুষ্টিমেয় কয়জনে কাজ করিয়া যাইতেছ। প্রতিদিন তোমরা কোনও না কোনও বাড়ীতে গিয়া গৃহস্বামীর মঙ্গলার্থ এবং জগজ্জনের কুশলার্থ হরিওঁ-কীর্ত্তন করিয়াছ, আজও করিতেছ এবং এভাবে করিয়াই যাইতে থাকিবে, ইহাই তোমাদের পণ হইয়াছে। রবিবার দিন তোমরা বিরাট ভাবে নগরকীর্ত্তন বাহির করিতেছ। সংখ্যায় অল্প বলিয়া ভয় পাও নাই, শত শত লোক আসিয়া

তোমাদের সঙ্গী হইতেছেন। শুধু তোমাদেরই দুই তিনটী কণ্ঠে নহে, শত কণ্ঠে আজ সুমধুর সুরে প্রতি রবিবারে পল্লীর প্রতিটি পথে এবং প্রতিটি গৃহদ্বারে ধ্বনিত হইতেছে,—"হরিওঁ,—ঈশ্বর আছেন।"

সংখ্যাল্পেরাও সংখ্যাগুরু হইতে পারে, ছোট্ট জায়গায়ও বড় কৃতিত্ব দেখান যায়, এই দুইটী কথা তোমরা নিজেদের নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণে প্রমাণিত করিয়াছ। তোমাদের গ্রাম আমার যাইবার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে। যদিও আমি সূক্ষ্মভাবে তোমাদের প্রতিটি কীর্ত্তনাঞ্জলিতে এবং নগরকীর্ত্তনে তোমাদের সাঙ্গে থাকি, তথাপি স্থূলভাবেই আমি তোমাদের গ্রামে যাইতে প্রলুব্ধ হইয়াছি। তোমরা অনায়াসে সকলকে বলিতে পার—"বাবামণি আসিবেন।"

কবে আসিব? তোমরা জানো, আজ প্রায় আড়াই মাস কাল আমার শরীর ডাক্তারের হাতে পড়িয়া আছে। প্রথম দেড় মাসে তাঁহারা কোনও প্রাণীকে আমার সহিত দেখা করিতেও দেন নাই। এখন শুধু রবিবার দেখা করিতে দেন। শীঘ্রই বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইব। ফিরিয়া আসিবার পরে যে-কোনও একটী সুবিধাজনক রবিবার দেখিয়া তোমাদের গ্রামে ঢুকিয়া পড়িব। এমন ভাবে ঢুকিব যে, ঐ গ্রাম হইতে আর আমাকে কেহ বাহির করিতে পারিবে না।

গুরুপদেশ অবনত মস্তকে মান্য করিয়া তোমরা ক্ষুদ্র একটী গ্রামেই এক বৃহৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তোমরা গ্রামের প্রায়

প্রতিটি প্রাণে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়াছ। তোমাদের ওখানে আসার ব্যাপারে আমারও আর দেরী সহিতেছে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ
গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি আমার দীক্ষিত শিষ্য, কথাটা ভাবিতে কি আনন্দ লাগে। দীক্ষা দিবার কালে তোমার কাণে প্রথার দায়ে একটা মন্ত্র ঢালিয়া দেই নাই, আমার নিজের সমগ্র সত্তাকে তোমার ভিতরে ঢালিয়া দিয়াছি। আমার যাহা কিছু সাত্ত্বিকী শক্তি, জীবনীয় প্রভাব, দূরদূরান্তগামী কল্যাণভাবসমূহ সব তোমাতে দিয়াছি। দীক্ষা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে, দীক্ষা জীবনের একটা অত্যাশ্চর্য্য ও বিরাট্ ঘটনা। তোমরা দীক্ষা নিবার পরে যদি আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও আত্মত্যাগকে তোমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে আপ্রাণ প্রয়াসী হও, তবেই দীক্ষা সার্থক।

সন্তান প্রসব করিয়া মায়েরা দুর্ব্বল হন। দীক্ষা দিয়া গুরুরা দুর্ব্বল হন। কিন্তু মায়ের শরীরের ভিতরে স্বাভাবিকী সঞ্জীবনী

শক্তি থাকার দরুণ, কাল-সহকারে তিনি ধীরে ধীরে পুনরায় সম্পূর্ণ সবলা হন। গুরুর ব্যাপারও তাহাই। তিনি নিয়ত নিজেকে পরমাত্মার সংসর্গে লাগাইয়া রাখেন বলিয়া দীক্ষাদানজনিত দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণ অনতিবিলম্বে ঘটিয়া যায়। তথাপি দীক্ষাদান একটা দুরূহ কার্য্য, যাহা আমাকে তোমাদের জন্য করিতে হয়।

শুধু তাহাই নহে, আমার জীবনে আদর্শ ফুটিয়া না উঠিলে, আমি শুধু বচনের বাহারে বাজিমাৎ করিতে চাহিলে, তোমরা দীক্ষিতের দল দিশাহারা হইয়া বিপথে চলিতে পার। এজন্য আমাকে এমন অনেক কৃচ্ছ্র সাধিতে হয়, যাহার খবর তোমরা জান না। এই জন্য দীক্ষাদানের পরে আমি প্রত্যাশা করিব যে তোমরা যেন প্রত্যেকে সাধন কর।

শিষ্য হইলে কিন্তু সাধন করিলে না, ইহা এক চমৎকার প্রহসন। প্রত্যেকে তোমরা সাধন করিও। তোমাদের সাথে আরও যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে সাধন করিতে উৎসাহ দিও। তোমাদের প্রতিজনের চোখে মুখে সাধন-সঞ্জাত দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠুক। তোমাদের চলনে, বলনে, কর্ম্মে ও বিশ্রামে সাধন-সিদ্ধ তাপসের সারল্য, সততা, অকুতোভয়তা বিকশিত হইয়া উঠুক। তোমাদের মুখের পানে তাকাইয়া তার্কিকের তর্কস্পৃহা স্তব্ধ হউক, দুর্ব্বৃত্তের ঔদ্ধত্য দূর হউক, চিরচঞ্চল অস্থিরমতির চাপল্য বিনাশপ্রাপ্ত হউক। হও তোমরা মানুষমাত্রের নিকট বলের উৎস, আশার পাত্র, উৎসাহের বহ্নি।

জীবনে ভালবাসিয়াই সুখ, আর সুখ কিছুতেই নাই। যে ভালবাসে, সেই সুখী। কিন্তু এই ভালবাসা যদি পঙ্কিল হয়, তবে ইহা গরলের আকর হয়। অন্তরের ভালবাসা যাহাতে নিত্য-নবায়মান অমৃতই থাকিতে পারে, তাহারই জন্য তোমাদের সাধনের প্রয়োজন। সাধন করিলে ইহা বুঝিতে পারিবে। শুধু যুক্তি দ্বারা, শুধু অনুমানের দ্বারা ইহার প্রমাণ হয় না, তাই বুঝিতেও পারা যায় না। আমি তোমাদের জন্য দীক্ষা-সূত্রে প্রেমামৃতপারাবারের পথ খুলিয়া দিয়াছি মাত্র। সেই অমৃত আহরণ করা, পান করা, জগদ্বাসীকে পান করান, ঐ অমৃতে অবগাহন করিয়া কোটি জন্মের তাপ বিদূরণ করা বাবা তোমাদের হাতে।

ভগবানের নামের সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য স্বভাব-সম্পদের মতন ণরপনা আপনি চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তথাপি ব্রহ্মচর্য্য পরিরক্ষণের জন্য তোমাদের সতর্ক প্রহরার এবং একাগ্র চেষ্টার প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মচর্য্যটীতে যে যতটুকু প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, তাহার প্রভাবশক্তি তত বাড়িবে। ব্রহ্মচর্য্যহীন অনেক প্রতিভাবান্ কবি, চিত্রকর, নাট্যকার, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের নাম তোমাদিগকে অবিরত শুনান হইতেছে। কিন্তু ঐ কুযুক্তিতে কর্ণপাত করিও না। উঁহারা যদি ব্রহ্মচর্য্যবান্ পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে জগৎকে আরও অনেক কিছু দান করিয়া যাইতে পারিতেন। তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাসী হও এবং দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ভাবে যে যখন যতটা পার ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবার চেষ্টা কর। ইহার পরিণাম-ফল তোমার ও প্রতিবেশীদের, দেশের ও জাতির পক্ষে পরম কল্যাণকর হইবে।

সাধন করিবার জন্যই আমার কাছে দীক্ষা নিয়াছ। সমাজ-সংস্কারের নাম করিয়া সমাজ-মধ্যে নূতন নূতন কলহ সৃষ্টি করিতে যাইও না। জাতিভেদপ্রথাকে রক্ষা করিবার জন্য শূদ্র ও অনাচরিত জাতিগুলির মাথায় ডাণ্ডা মারিবার জন্য তোমাদের উদ্যত হইবার প্রয়োজন নাই। আবার, যাঁহারা এই প্রথার কতকটুকু অংশকে অবলম্বন করিয়া চলিতে চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা সম্পূর্ণতঃ ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে জোর করিয়া তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত সামাজিক ব্যবহার হইতে ছিনাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াও বৃথা উত্তেজনার সৃষ্টি করিও না। তোমাদের কাজ উপাসনা করা, নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনার সময়ে নিজ গৃহ-নিভৃতে একান্তে বসিয়া পরমাত্মায় আত্মনিমজ্জন করা, সমবেত উপাসনার সময়ে সকলের আত্মা একই আত্মা, সকলের প্রভু একই প্রভু, সকলের কণ্ঠ একই কণ্ঠ, সকলের লক্ষ্য একই লক্ষ্য, সকলের প্রেম একেতে অর্পিত হইয়া যাইবার ফলে সকলে মিলিয়া একেবারে একাত্ম হইয়া যাওয়া,—ইহাই তোমাদের কাজ। ইহার মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদবিচারকে বিতর্কের মুখে প্রবেশ করিতে দিও না। যার যার ঘরে যার যার ব্যক্তিগত সংস্কার লইয়া মানুষ যেমন যে ভালবাসে, সে তেমন থাকুক, সমবেত উপাসনার কালে আমরা সকলে এক, অভিন্ন, অদ্বয়।

তোমরা সমবেত উপাসনার আসরকে মানুষের সহিত মানুষের কলহ সৃষ্টির একটী উত্তেজনা কারণে পরিণত করিও না। তোমরা সববেত উপাসনার পরে উপাসনা-লব্ধ প্রশান্ত মনটী নিয়া যার

যার ঘরে ফিরিয়া যাইবে। মনের প্রশান্তি মনের বলবিধান করে। সমবেত উপাসনা তোমাদের মনের টনিক হউক। তোমাদের কর্ম্মোদ্যমের এক অসাধারণ নিয়ামিকা হউক। এই একটী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তোমরা এক হইতে শিখ। দুই আড়াই হাজার বছর ধরিয়া হিন্দু নামে পরিচয়-প্রদানকারীরা কেবলই নিত্য নূতন কলহের সূত্র আবিষ্কার করিয়া নিজেরা নিজেদের শত্রুতা করিয়াছে। এখন প্রত্যেকে তাহা হইতে ক্ষান্ত হও, এবং তাহার পরমোৎকৃষ্ট ও অনবদ্য উপায় স্বরূপ সমবেত উপাসনাকে অবলম্বন কর।

শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে বিগত বৈশাখ মাসে তোমরা সমস্ত মাসটীই প্রতিদিন কোথাও না কোথাও সমবেত উপাসনা করিয়াছ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সমবেত উপাসনা সাধারণতঃ সপ্তাহে একটী নির্দ্দিষ্ট দিনেই করিবার বিধি। ঐ একটী দিনে সন্নিহিত সকল স্থানে সকল উপাসক একত্র বসুক পরমপ্রভুর নাম করিতে, ইহাই উদ্দেশ্য। প্রত্যহ সমবেত উপাসনা করিতে গেলে ঠিক এই মিলনটী আর হয় না। প্রায় প্রত্যহই একটী সমবেত উপাসনায় প্রত্যেকে যোগদান করিতে পারে না। আজ যাহাকে পাইলাম, কাল হয়ত সে আসিতে পারিবে না। গতকাল যাহাকে পাইয়াছি আজ হয়ত সে আসিতে পারিল না। সকল দিকের সবাইকে একত্র পাওয়ার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে, তাহা আর পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া গেল না। তবে বিশেষ কারণবশতঃ বৈশাখ ও পৌষ মাস তোমাদের নিকটে একটি অসাধারণ কৌলীন্য অর্জ্জন

করিয়াছে বিধায় এই দুইটী মাসে যে সমবেত উপাসনার সংখ্যা বেশী হইবে, ইহা সত্যই স্বাভাবিক। তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না।

যে দিন যে বেলা তুমি সমবেত উপাসনায় যোগদান করিলে, সেদিন সেই বেলায় তোমার ব্যক্তিগত একক উপাসনা করিবার প্রয়োজন থাকে না। এ যেন এক প্রকারের সন্ধ্যাবাদ-বিধি বা বৈদিক অনধ্যায়। রোজই যদি তোমার ব্যক্তিগত উপাসনা এই ভাবে বাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত একক উপাসনাতে যে আর একটী বিশেষ আনন্দ আছে, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে। সমবেত উপাসনায় নাম-জপের সময় খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত একক উপাসনায় নামজপের নির্দ্দিষ্ট কোনও সময়-সীমা বাঁধা নাই। যতক্ষণ মন নামে না মজিবে, যতক্ষণ প্রাণের গভীর তৃষা না মিটিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তোমার একক ব্যক্তিগত উপাসনায় নাম জপিয়া যাইবে। তুমি দেরী করিয়া উঠিলে অন্য লোকদের অসুবিধা হইবে, এই ভাবনা তখন তোমার নাই। সুতরাং একক উপাসনাকে বাদ দিয়া কেবলই প্রতিদিন সমবেত উপাসনা করিয়া যাওয়ার বিধান দেওয়া চলে না।

অবশ্য, যে সকল ভাগ্যবান্ পুত্রকন্যা আমার মাঝে মাঝে প্রচার কর্ম্মে বাহির হয়, তাহারা প্রত্যেক স্থানে গিয়াই একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে। যেহেতু তাহারা এক স্থানে বেশী দিন থাকে না, সেই হেতু তাহাদিগকে প্রায় প্রতিদিনই একটী করিয়া সমবেত উপাসনার পরিচালনভার নিতে হয়। সকলের

সঙ্গে মিলিবার পক্ষে সমবেত উপাসনার মতন সদুপায় আর কিছু নাই। প্রত্যহই সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে হওয়ায় ইহাদের ব্যক্তিগত উপাসনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য ইহাদিগকে শেষরাত্রে উঠিয়া বেশী সময় দিয়া ব্যক্তিগত উপাসনা করিবার উপদেশ আমি দিয়া থাকি।

এবারকার নূতন দীক্ষিত ছেলেদের প্রত্যেককে প্রচার-কর্ম্মে লাগাইয়া দাও। কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার করুক। একটা দৃঢ় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট শক্তিশালী মহাজাতি তোমাদের লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি উত্তর প্রদেশের লোক হইয়াও আসামে আসিয়া জনসেবা করিতেছ, আবার বাংলা ভাষা এতটা শিখিয়াছ যে, অনায়াসে অতি সুন্দর পত্র লিখিতেছ দেখিয়া অবাক্ হই নাই। কারণ প্রকৃত সেবার আকাঙ্ক্ষা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে পৃথিবীতে কিছুই অসাধ্য নাই।

বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, খাল-বিল কোনও কিছুকেই দুরধিগম্য, দুরারোহ ও অনতিক্রম্য মনে করিও না, লক্ষ্য যখন তোমার হইতেছে মানুষের মনের জমাট অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের পরম কৃপাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। ভগবানের কাজ যাহার হাতে, তাহার অন্তরে কোনও ভয় থাকিবে না, কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া সে অবিবেকী রাজার দণ্ডকে গ্রাহ্য করিবে না, অবোধ সমাজের উৎপীড়নকে আমলে আনিবে না, ভ্রমান্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীর অত্যাচারকে ভয় পাইবে না, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বন্য মহিষ ও কুম্ভীর-হাঙ্গরকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখিবে না।

পাহাড়ী বস্তিগুলিতে ভ্রমণ সুরু করিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। যেখানে যাইবে, মুক্তকণ্ঠে এই চির-অনাদৃত অনীকিনীকে ডাকিয়া বলিবে, হে সুপ্ত ব্রহ্ম, জাগিয়া ওঠ, রণসাজ পর, নিখিল জগতের সমগ্র মানব-জাতির পরম মুক্তির ব্রত-সাধনায় তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, দুঃখীর দুঃখ তুমি ঘুচাইবে, দরিদ্রের দারিদ্র্য তুমি বিদূরিবে, শোকার্ত্তের অশ্রু তুমি মুছাইবে, সুখলেশহীন চির-অশান্তকে তুমি শান্তির শুভপথে টানিয়া আনিবে, নিজেকে তুমি সামান্য মনে করিও না, তোমার দায়িত্ব অনেক, তোমার কর্ত্তব্য অপার, তোমার যোগ্যতা অসীম। ইহাদিগকে ডাকিয়া বল,—পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, তোমরা অমানুষ নহ, তোমরা মানুষ, দেবস্বভাবে আত্মপ্রকাশ

করিয়া তোমাদিগকে মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম বা দেবতা হইতে হইবে।

মিকির, মিজো, ত্রিপুরা ও উত্তর কাছাড়ে যেখানে যাহাকে পাও, বুকে টানিয়া আন, ভালবাসা দিয়া তাহাদের মনঃপ্রাণ জয় কর, বুঝিতে দাও যে তাহাদের অনেক আপন জন জগতের দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে। সকল আপনদিগের মধ্যে আজ চেনাচেনি জানাজানি হওয়া প্রয়োজন। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুপুন্‌কী ঠিকানায় লিখিত তোমার পত্র আমার এখনও নয়নগোচর হয় নাই। ২রা চৈত্র হইতে আমার শরীর পীড়িত। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ঘটায় ৯ চৈত্র কলিকাতায় চলিয়া আসি। এই সময়ের মধ্যেও দুই একখানা পত্র পড়িয়াছি কিন্তু বাকী প্রায় সবই স্তূপাকারে জমিয়া আছে। তোমার দ্বিতীয় পত্রে তোমার সকল বিজ্ঞাপিতব্য বিষয় অবগত হইয়া সুখী হইলাম।

তুমি চাহ সংযমী থাকিতে, স্ত্রী তাহা চাহে না। তুমি সংযমী হইতে চাহ তোমার জগৎকল্যাণকারিণী শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য, তোমার ঈশ্বরানুধ্যানকে নিবিষ্টতর করিবার জন্য। তোমার স্ত্রী এসব বোঝে না। সে ভাবে, রতিসুখ না থাকিলে জীবন বৃথা। দুই জনের চিন্তাজগতের মধ্যে কোথাও মিল নাই। ইহাতে তুমি অদীর হইয়া পড়িয়াছ।

কিন্তু বাবা, অধীর হইবার কিছু নাই। তোমাকে ধীর ভাবে বিচার করিতে হইবে যে, এইরূপ হাস্যকর ও অসম্পূর্ণ ধারণা তোমার স্ত্রীর মনে কেন সৃষ্ট হইল। অন্য নারীরা বলিয়া থাকে, রতিসুখের জন্যই বিবাহ, বিবাহের অন্য কোনও অর্থ বা সার্থকতা নাই, ইহা শুনিতে শুনিতে তোমার স্ত্রীর মনে এই ধারণাটী বদ্ধমূল হইয়াছে কিনা, দেখ ত'! যদি ইহাই কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিপরীত কথা দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাহাকে শুনাইতে শুনাইতে তাহার মনে প্রশ্ন জাগিবে যে, রতিসুখই কি সত্য সত্য বিবাহিত জীবনের চরম প্রাপ্তি ও পরম লাভ?

কয়েকটী সন্তানের তোমরা জনক-জননী। বহুবার তাহাকে রতিসুখাস্বাদন দিবার এবং নিজে রতিসুখাস্বাদন লাভ করিবার সুযোগ তোমাদের হইয়াছে। তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, এই সুখ কতক্ষণের মত স্থায়ী হইয়াছে? এই সুখ কি অনন্ত ও অফুরন্ত? এই সুখ কি নিত্যকালস্থায়ী? একবার এই সুখটুকু

পাইলে কত কাল তাহার আস্বাদনটুকু থাকে? ইহা কি অবিনশ্বর সুখ, না ক্ষণ-ভঙ্গুর সুখ?

তাহার মনে এই প্রশ্নগুলি জাগাও।

মাত্র এই কাজটুকু করিতে পারিলেই তোমার সঙ্কটমোচনের বারো আনা হইয়া গেল বলিয়া জানিবে।

পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে যে চাহে, তাহা ভালবাসার টানে, যৌন আকাঙ্ক্ষার টানে নহে। ভালবাসা একজনকে আর একজনের সন্নিহিত করে, কিন্তু পূর্ব্বেকার যৌন অভ্যাস হঠাৎ তাহাদের প্রেমমুগ্ধ আবেশকে একটা পাশবিক রূপান্তরের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কখনো কখনো যৌন মিলন যে স্বামী ও পত্নীর ভালবাসার গভীরতা সম্পাদনের সহায়ক হয় না, তাহা নহে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের ভালবাসা যৌন-মিলন-নিরপেক্ষ। সেই নিরপেক্ষ ভালবাসাই স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত ভালবাসা।

অশিক্ষিত পুরুষ বা নারীরা এত কথা বোঝে না। এই জন্যই তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন।

তোমার স্ত্রী যে তোমাকে অনেক সময়ে একরূপ জোর করিয়াই দৈহিক ব্যাপারে লিপ্ত করিতেছে, তাহার কারণ এই নহে যে, সে সত্য সত্যই প্রত্যেক সময়েই ঠিক ঐ জিনিষটীরই কামনা করে। অনেক সময়েই তাহার মনে ঠিক দৈহিক জান্তবতার আবেগ বা আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু অনুক্ষণ যদি কোনও নারীর মনে এই আশঙ্কা বা এই আতঙ্ক থাকে, "এই বুঝি আমার স্বামীর ভালবাসা আমার উপর হইতে উঠিয়া গেল বা আমাতে তাঁহার ভালবাসা

কমিয়া গেল" তবে স্বামীকে নিজের অন্তরের কাছে টানিয়া রাখিবার জন্য একটী অশিক্ষিতা নারীর আর কোন্ আকর্ষণীয় বস্তু আছে? বিদ্যা থাকিলে, বুদ্ধি থাকিলে বা অন্য কোনও বিশেষ কৃতিত্ব থাকিলে স্বামীকে আকর্ষণ করিবার জন্য সে তাহার পসরা খুলিয়া ধরিয়া স্বামীকে আকর্ষণ করিত। যাহার ঐ সব কিছুই নাই, তাহার গ্রাম্য মন ও অশিক্ষিত সংস্কার যৌন আকর্ষণ দিয়াই স্বামীকে হাতের মুঠায় ধরিয়া রাখিতে চাহিবে।

হতাশ হইও না। চেষ্টা চালাও। পত্নী তোমার সংযমানুকূল নিশ্চয়ই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(১০-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার পত্র পাইয়া অবাক্ হইয়াছ। মাত্র সাতটী পংক্তিতে লেখা পত্র তোমাকে সপ্ত সমুদ্রের তলে নিয়া ফেলিয়াছে। তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না যে, ইহা আবার কি করিয়া সম্ভব।

হাঁ বাবা, ইহা সম্ভব। অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহা সম্ভব। যাহা একদা ক্ষুদ্রাকারে হইয়াছে, তাহা অতীত বৃহৎ আকারেও সম্ভব। তবে, এই বৃহত্ত্ব একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্তই বাড়িতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন চা-বাগান। একটা চা-বাগান ছোট করিয়া হইলেও আশি নব্বই একর জমি নিবে। ইহা বাড়িতে বাড়িতে দুইশত পাঁচশত একরও হইতে পারে কিন্তু এক লক্ষ একর জমি নিয়া একটা বাগান হইতে পারে না। তিন চারি শত একরের বেশী জমি হইতে গেলেই একটা বাগানকে দুইটা বা তিনটা বাগানে পরিণত করিয়া দুইটা বা তিনটা আলাদা আলাদা ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়। যেমন ধর, কটন মিল। একটা মিলে দুই হাজার বা পাঁচ হাজার তাঁত চলিতে পারে, বিশ লক্ষ বা পঞ্চাশ লক্ষ তাঁত চলিতে পারে না। অপরিমিত সংখ্যায় তাঁত চালাইবার অর্থ যাহার আছে, সেও যোগ্য ম্যানেজারের অভাবে একটা দির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক তাঁত দিয়া একটা মিল চালু করিয়া, আবার নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক তাঁত বসাইয়া দ্বিতীয় আর একটা মিল খোলে। একই মালিকের দশটা কটন মিল থাকিতে পারে কিন্তু দশটা মিলের সব তাঁত একত্র করিয়া একটা অতি বিরাট মিল করিবার সাহস কেহ করে না। এই দৃষ্টান্ত দুইটী মনে রাখ।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির অতীত অন্বেষণ কর। দেখিবে, শিষ্য গুরুগৃহে গিয়া গুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছে। ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির ইহা একটী অবিস্মরণীয় বিশেষত্ব। আবার দেখ, অগ্রসর ছাত্র অনগ্রসর ছাত্রকে পড়াইতেছে,

ফলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বশাস্ত্রই অধীত হইতেছে, আবার অগ্রসর ছাত্র অনগ্রসর ছাত্রকে পড়াইবার কালে নিজের শিক্ষাটীকে হাতে কলমে প্রয়োগ করিয়া যাচাই করিয়া পাকা করিয়া লইতেছে।

অতীতকে একেবারে উড়াইয়া দিও না। অতীতের পুনরাবর্ত্তন শুধু সম্ভই নহে, পরম প্রয়োজনীয়ও বটে। আমি অতীতের অন্ধ ভক্ত নহি কিন্তু অতীতের সত্যকে অস্বীকার করিব কি করিয়া?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিলেই ত' তোমাদের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইয়া যায় যে, কি করিয়া সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত শিক্ষা নিলে ও দিলে, তাহার ফলে যাহারা বাহির হইয়া আসিবে, তাহাদের চাকুরী দিবে কে?

অতীতের শিক্ষক চাকুরী করাকে শ্ববৃত্তি বা কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন এবং দ্রোণাচার্য্য যে ধৃতরাষ্ট্রের বাড়ীতে চাকুরী নিলেন, তাহা হইতেই ব্রাহ্মণের পতন সুরু হইল বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং শিক্ষাকে যদি সত্য সত্য ভারতীয় করিতে হয়, তবে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন পরের চাকুরীর লালচ না জন্মে, পরের চাকুরীর আবশ্যকতা না আসে।

আশা করি, এখন আমার পূর্ব্বপত্রে লিখিত সংক্ষিপ্ত কয়টী কথা তোমার বোধগম্য হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ   গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুপ্রশ্নপূর্ণ তোমার পত্রখানা পাইলাম। কীর্ত্তন, উপাসনা, নামযজ্ঞ, নগর সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ প্রভৃতি কাজ সকল অবস্থাতেই পুণ্যজনক, কারণ ইহা দ্বারা চিত্তপ্রশস্তি জন্মে, ইহা দ্বারা চিত্ততাপ নাশ পায়।

অবশ্য, বরিশাল জেলার এক পল্লীগ্রামে রাত্রিতে একদল ডাকাত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়া ধনীর বাড়ীতে ঢুকিল, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাইয়া, আবার মৃদঙ্গ-করতাল-রবে পথ ও মাঠ মুখরিত করিতে করিতে কীর্ত্তন গাহিয়াই গ্রাম হইতে নিরাপদে প্রস্থান করিল। এইরূপ উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্য যে-কোনও উপলক্ষ্যে পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনাদি কর, সবই ভাল, সবই হিতকর, সবই লাভজনক ও প্রশংসনীয়।

কাহারও রোগ সারাইবার জন্য উপাসদা করিতে চাও, কর। কাহারও বিপৎ-ত্রাণের জন্য কীর্ত্তন করিতে চাও, কর। কাহারও পাপের ক্ষালণের জন্য পাঠ করিতে চাও, কর। যে উদ্দেশ্যে করিতে চাহ, একাগ্র চিত্তে কাজ করিলে, সে উদ্দেশ্য আংশিক

হইলেও সফল হইবেই হইবে। কিন্তু কাহারও মেয়ে চুরী করিবার জন্য, কাহারও অপযশ প্রসারিত করিবার জন্য, কাহাকেও অপদস্থ করিবার জন্য বা কাহারও ক্ষতিসাধনের জন্য তুমি ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়া অনুষ্ঠানের মর্য্যাদাহানি ঘটাইতে পার না। নারীর উপর বলাৎকার করিবার উদ্দেশ্যে কেহ যজ্ঞকুণ্ডে সমিধ্ ও হব্য চড়াইলে সেই যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের আবির্ভাব হয় না। কোনো কোনো কাজ প্রধানতঃ নিজ স্বভাবেই পুণ্যকর্ম্ম, অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাহা করিলে সে আর পুণ্যকর্ম্ম থাকে না। কোনো কোনো কাজ যে স্বতঃই পুণ্যকর্ম্ম, তাহার কারণ এই যে, এই সকল কাজ করিতে গেলেই মনের চঞ্চলতা হ্রাস পায়, কামনার আকুলতা কমে, বাসনার জঞ্জাল আপনা আপনি অপসারিত হয়। যাহা স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্ম, তাহাকে পুণ্যময় থাকিতে দিবার জন্যই তোমাদের দৈহিক শুচিতা, বাচিক সংযম ও মানসিক একাগ্রতা নিয়া ব্রতী হইতে হয়।

ভগবানের নামজপ করার মতন লাভজনক পুণ্যকর্ম্ম জগতে আর কিছু নাই। একাজ করিতে তোমার বিন্দুমাত্র পরাপেক্ষা নাই বলিয়াই এই কাজটী অনন্যসুন্দর। জপ করার প্রকৃত মানে নামটী পুনঃপুনঃ মনে মনে সুস্পষ্ট ভাবে অর্থ বুঝিয়া স্মরণ করা। পুনঃপুনঃ স্মরণ না করিলে তাহা জপ-পদবাচ্য হয় না। সুস্পষ্ট ভাবে স্মরণ না করিলে তাহা জপ হয় না, তাহা হয় জপের অনুকরণ মাত্র। অর্থ বুঝিয়া স্মরণ না করিলে মনের ত্রাণ হয় না বলিয়া যতবার

নাম স্মরণ করিবে, ততবারই এই নাম কাঁর, কি তাঁর মহিমা, কত তিনি মহৎ, কত তিনি বৃহৎ, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছু তিনি, তবু তাঁর যে শেষ নাই, প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যে তিনি, তবু তিনি যে ক্ষুদ্র নন,—এই ভাবকে নিরন্তর অন্তরে জাগরুক রাখিয়া নাম করিলে নাম-ব্রহ্ম ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া জাপকের কোটি জন্মের অপসংস্কার নাশ করিয়া দেন।

যেখানে দেখিবে কেহ নামজপে বসিয়াছে, মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। এই প্রণাম বিশ্বপ্রভুরই চরণে পৌছিবে। নামানন্দী পুরুষকে সংসার-মরুভূমিতে শ্যামল খর্জ্জুর-কুঞ্জের ন্যায় শীতল আশ্রয় আর নয়নাভিরাম প্রেরণাগার বলিয়া মনে করিবে। কেহ কেহ ধর্ম্মের ভানে জগতের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া ধার্ম্মিক, সাধক বা জাপক মাত্রকেই তোমার সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়োজন নাই। যেই দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে, সেই দিক হইতেই তুমি নাম-সাধনের দিব্য উন্মাদনা সংগ্রহ কর। নিজে নামানন্দী হও, নামের আনন্দে বিশ্বভুবনকে আনন্দময় কর।

প্রকৃত ভক্তেরা বিপদ আপদ দেখিলে তাহাকেও এই বলিয়া অন্তর দিয়া অভিনন্দন করেন যে, এতদিন বেশ দিব্যি ভগবানের নামটী ভুলিয়া থাকা চমৎকার চলিতেছিল, এখন বিপদের ষ্টীম-রোলারের চাপায় পড়িয়া ত্রাহি-মাং করিয়া ভগবানকে ডাকিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর্ত্তের ডাকও একদা ভক্তের ডাকে পরিণত হয়। ভগবানের নাম নিলেই তাহাতে লাভ,—ক্ষতি কিছুমাত্র নাই।

একদল রাজনৈতিক চিন্তাকারী ব্যক্তিরা ধর্ম্ম, ভগবান, ইশ্বরোপাসনা প্রভৃতিকে মানুষের উপরে মানুষের অত্যাচার করিবার কলকাঠি বলিয়া একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের তথ্য যে সবই ভুল, এমন বলা চলে না কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি নির্ভুল নহে। ভগবান এমনই একটী জিনিষ যে, তাঁহাকে জীবন হইতে বাদ দিয়া দিলে জীবনের মহিমা কমিয়া যায়, মাধুর্য্য হ্রাস পায়, অনাবিল শান্তি জীবনে সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। ভগবান বলিয়া কেহ নাই, একথা যদি তর্কস্থলে স্বীকারই করিয়া যাই, তবু এই "নাই-বস্তুটী"ই মানুষের সব চেয়ে গুরুতর দুঃখের সময়ে সান্ত্বনার আশ্রয় হইয়া তাহা দুঃস্বপ্নভরা রজনীকে সুনিদ্রায় পার করিয়া দেয়। এক্স্ (X) বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই কিন্তু তাহাকে একটী ভাবী সিদ্ধান্ত স্বরূপ ধরিয়া লইয়া গণিত কষিতে কষিতে অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নূতন আবিষ্কারই এই জগতে না করিয়াছেন। তোমরা পরের মুখে ঝাল খাইও না। ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রত্যক্ষ দেখ যে, সত্য সত্যই কাম প্রশমিত হয় কি না, ক্রোধ উপশান্ত হয় কি না, ভয় বিদূরিত হয় কি না, অশান্তি কমে কি না। যাহার কমে না, সে যাহা ইচ্ছা করুক গিয়া কিন্তু আমাদের কমে, তাই আমরা এই "নাই-বস্তু"টীকেও শত চেষ্টায় আর ছাড়িতে পারিতেছি না।

তোমাদিগকে আমি সমবেত উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে বলিয়াছি। শুধু সমবেত উপাসনারই

অব্যবহিত পূর্ব্বে নহে, যেখানে নগর-সঙ্কীর্ত্তন তোমাদের অনুষ্ঠান, যেখানে কীর্ত্তনাঞ্জলি তোমাদের অনুষ্ঠান বা যেখানে উদয়াস্ত কীর্ত্তন, উদয়াস্ত জপ, উদয়াস্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গান, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প তোমাদের অনুষ্ঠান, সেখানেও আমি অখণ্ড-সংহিতাটীকে অব্যবহিত পুর্ব্বে পাঠ করিয়া নেওয়া বাধ্যকর করিয়া দিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য বহুবিধ। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তার সমাবেশ দ্বারা মন হইতে অন্যান্য পূর্ব্বচিন্তাকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গায়কেরা যেমন প্রত্যেক পালার পুর্ব্বে একটী "তদুচিত" গৌরচন্দ্রিকা গাহেন, ইহা কতকটা তদ্রূপ। এই কারণে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠকালে অনুষ্ঠেয় ব্যাপারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অংশ পুর্ব্ব হইতে নির্ব্বচন করিয়া নেওয়া ভাল।

তোমরা কেহ কেহ বলিতেছ যে, আমরা যখন সকল ধর্ম্মমতের ও সকল ধর্ম্মপথের প্রতিই সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তখন গীতা, চণ্ডী, দেবীভাগবত, স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মনুসংহিতা আদি আমাদের উপাসনানুষ্ঠানের পূর্ব্বে পড়িব না কেন? ইহার জবাব উপরেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধার বিরহ-গান গাহিবার আগে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-চন্দ্রিকাই গাহিতে হয়, মিলন-চন্দ্রিকা নহে। শ্রীরাধার মান ভঞ্জন বা গোপীদের নৌকাবিলাস গাহিবার আগেও তদুচিত একটী গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া লইতে হয়, তদ্বিরুদ্ধ এমন একটী গৌরচন্দ্রিকা নহে, যাহা বেমানান, বেখাপ্পা। এজন্যই

তোমাদের সমবেত উপাসনাদির পূর্ব্বে তোমরা অখণ্ড-সংহিতাই পড়িবে, অন্য গ্রন্থ নহে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা অবাঞ্ছনীয় নহে বরং সময় ও সুযোগ থাকিলে প্রয়োজনীয়। নানা বিরুদ্ধমতাবলম্বী শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের দ্বারা সকল বিরোধের অতীত একটী সর্ব্বসম্মত পরম সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সহায়তা হয়। কিন্তু সেই কাজটী তোমরা আলাদা পাঠচক্র করিয়া তাহাতে করিবে। তোমাদের উপাসনা, কীর্ত্তন, জপ আদির আগে তাহা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, তাহাতে লাভও কিছু নাই। রামধুন কীর্ত্তন করিয়া সমবেত উপাসনা করার তাৎপর্য্যের সহিত একজন অখণ্ডের সমবেত উপাসনার মর্ম্মগত তাৎপর্য্যের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটুকু উৎকর্ষগত এবং এই পার্থক্যটুকুর দরুণই অখণ্ডের সমবেত উপাসনার পূর্ব্বে গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা ও জপজী-সাহেব পাঠ করিবার আবশ্যকতা পড়ে না। যাহা একান্তই আবশ্যক নহে, তাহাকে আনিয়া সমবেত উপাসনার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে উপাসনায় অসুবিধা উৎপাদিত হইবে।

অখণ্ডগণ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিবে, ইহাই আমার অন্তরের অভিপ্রায়। ব্রাহ্মণের অধিকাংশ আচার প্রশংসিত ও প্রশংসনীয়। অনেক স্থানেই অখণ্ডগণ যখন মৃত্যুর পরেও অশৌচ পালনে ও শ্রাদ্ধীয় সময় নির্দ্ধারণে একাদশ দিবসকে সম্মান দিতেছে, তখন জাতকাশৌচে অন্যরূপ হইবার কারণ দেখি না। তবে এই সকল

ব্যাপারে আত্মীয়পরিজনদের সহিত কলহ সৃষ্টি না করিয়া চলার চেষ্টাই উচিত।

ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি কোনও কদাচার দেখা যায় এবং সেই কদাচারকে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজও যদি সহিয়া নিয়া থাকেন, তবু তাহা তোমার বর্জ্জনীয়।

আজকাল ব্রাহ্মণ-সন্তানে আর অব্রাহ্মণ-সন্তানে নানা স্থানে অসবর্ণ বিবাহ চলিতেছে। সমাজ তাহা মানিয়া নেয় নাই কিন্তু জাতি তাহা স্বীকার করিয়া নিতেছে। হিন্দুসমাজের একাংশ অসবর্ণ বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ভারতীয় জাতি অসবর্ণ-বিবাহের দ্বারা নিজেদের পরিপুষ্টি বিধানকে অপ্রার্থিত মনে করে নাই। করিলে, ইহার বিরুদ্ধে আইন রচিত হইত। অতীতেও অসবর্ণ বিবাহ খুব প্রশংসিত ছিল না, কিন্তু অনুলোম বিবাহ চলিত। প্রাচীন কালের অনেক প্রসিদ্ধ পুরুষ উচ্চজাতীয় পিতার ও নিম্নতর জাতীয়া মাতার সন্তান। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের প্রতি সকলেই খড়্গহস্ত ছিলেন। নিম্নজাতীয় পুরুষের ঘরে উচ্চজাতীয়া নারী বধূরূপে প্রবেশ করিলে অনেক স্থলে ইহাদের সন্তানেরা মাতার জাতি পাইত না, পিতার জাতিও পাইত না এই উভয়ের জাতি অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট এক জাতিতে অধঃপাতিত হইত। কিন্তু আজকাল যেই সকল অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, তাহাতে অনুলোম ও প্রতিলোমের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। হয়ত অনুসন্ধান করিলে ইহাও দেখা যাইতে পারে যে, উচ্চবর্ণের কন্যারাই অধিক সংখ্যায়

নিম্নবর্ণের পতিদের ঘরে যাইতেছে। বয়স্কা অনূঢ়া কন্যার বিবাহ-সমস্যার সহিত উচ্চকুলের কন্যাকে নিম্নকুলের ঘরে মহাসমাদরে আনিবার এক অত্যুচ্ছ্বসিত প্রচেষ্টা ইহার সম্মিলিত কারণ হইতে পারে। ট্রামে, বাসে, রেলে, বিমানে, স্কুলে, কলেজে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা হোটেল ও রেস্তোঁরায়, রাজনীতিক্ষেত্রে বা জনসেবায়, চাকুরীর ক্ষেত্রে ও হাসপাতালে সর্ব্ববর্ণের অনূঢ়-অনূঢ়াদের পরিচয়ের সূত্র সৃষ্ট হইতেছে। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী মিলন ঘটিতেছে। এই সকল ব্যাপারে আমাদের দিক হইতে নির্ব্বাক নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্ব নাই। বর ও কন্যা উভয়ের পিতামাতার সম্মতি নিয়া যেখানে বিবাহ, সেখানে আমাদের বিরুদ্ধতা করিবার কিছুই নাই। অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনা করিয়া যে বিাাহের পবিত্র বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহার গোড়ার দিকে এই অনুশাসনটী কঠোর ভাবে দেওয়া আছে যে, যেখানে বর ও কন্যার অভিভাবকদের সম্মতি নাই, তেমন স্থলে অখণ্ডমতে কোনও বিবাহ হইতে পারে না।

এই বিষয়ে ইহার অধিক বক্তব্য আমাদের দিক হইতে নাই। সমাজসংস্কারের দ্বারা দেশের কল্যাণের বিষয় অনেক মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে জাতিভেদটীকে দূর না করিতে পারিলে হিন্দুজাতির মঙ্গল নাই। জাতিভেদটী দূর হইয়া সকল জাতি একাকার হইয়া গেলে জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা-প্রতিশোধ প্রভৃতি অপস্পৃহা দূরীভূত হইবে, হিন্দুজাতি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে।

এই যুক্তি ত্রুটিহীন কি না, আর ত্রুটি থাকিলে কোথায় সেই ত্রুটি, তাহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিব না। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বীদের প্রতিপক্ষ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও অমনীষী নহেন। তাঁহাদের মধ্যেও চিন্তাশীল ও যুক্তিমান্ পুরুষেরা রহিয়াছেন। জনসভায় তাঁহারা কলিকা না পাইতে পারেন কিন্তু সমাজবাসীদের মনের উপরে তাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন। সে রাজত্ব এত পাকা যে, অনেকে তাহাকে অচলায়তন বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই অচল দুর্গেও মাঝে মাঝে চলমানতা পরিদৃশ্যমান হইয়াছে এবং সকলের অজ্ঞাতে অনেক পুরাতন জিনিষ সরিয়া পড়িয়াছে এবং নূতন জিনিষের আমদানী হইয়াছে। প্রতিপক্ষেরা তাহা লক্ষ্য করেন নাই বা চোখে পড়িলেও দেখিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের মতে, বারংবার-পশ্চিম দিক দিয়া উপদ্রুত বিপন্ন হিন্দুসভ্যতা আজ জগতে বাঁচিয়া থাকিত না, যদি জাতিভেদের মতন একটা সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত হিন্দুসমাজকে রক্ষা না করিত। তাঁহাদের মতে, জাতিভেদ চলিয়া গেলে হিন্দুর আর থাকিবে কি? হিন্দু তাহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী-হেতু মতবাদের উদারতায় অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ফলে তুচ্ছ জড়বস্তুর উপাসক হইতে সুরু করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসক পর্য্যন্ত, হেয় প্রেতোপাসক হইতে সুরু করিয়া নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক চার্ব্বাক বা অসিদ্ধেশ্বর সাংখ্যবাদী পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দু। মতবাদের এত বিভিন্নতাকে যাহারা অবহেলে উদাসীন দৃষ্টিতে মানিয়া লইল,

তাহাদের মধ্যে জাতিভেদরূপ সামাজিক প্রথাটুকু না থাকিলে হিন্দু কে আর অহিন্দু কে, ইহা চেনা যাইবে কি করিয়া?

আরও একটী কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। জাতিভেদকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে কিন্তু ইহা মরে নাই, মরিবে না, যতকাল চন্দ্র-দিবাকর থাকিবে, ততকাল হিন্দু থাকিবে এবং জাতিভেদও থাকিবে।

এই সকল উক্তির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রযোজ্য, তাহার মধ্যেও আমি মাথা গলাইতে চাহি না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ মতামত ব্যাপক ভাবে প্রচার করুন, প্রত্যেকটী মানুষ তাহা শুনিতে যেন পায়, প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য চিন্তা করিবার অবসর যেন পায়। প্রচার করিতে নামিয়া তারপরে যে হঠাৎ একদিন প্রচারকেরা থামিয়া যান, এইটাই ত' আমার আফশোষ। তাঁহারা যদি নিজ নিজ অকুণ্ঠিত চিত্তে যুগযুগ ব্যাপিয়া দেশের প্রত্যেকটী নগরে, প্রত্যেকটী পল্লীতে, প্রত্যেকটী কুটীরে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবিরাম শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ শেষনাগশয়নে শায়িত গণনারায়ণ নিশ্চিতই জাগিয়া উঠিবেন। তারপরে তিনি ইচ্ছা হয় জাতিভেদ-প্রথাকে রাখিবেন, নয় নির্ব্বাসিত করিবেন। জাতিভেদ নিয়া আমার কোনও দুশ্চিন্তা নাই।

আমার চিন্তা মানুষের নিজস্ব মূল্য লইয়া। যে যেই জাতির হউক, মানুষ হিসাবে তাহার মূল্য বাড়িল কি না। আমি এই একটী বিষয় ছাড়া অন্যদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে চাহি না।

আমি জাতিভেদ ভাঙ্গিতেও আসি নাই, রাখিতেও আসি নাই। পরমেশ্বরকে পাইবার, জানিবার, বুঝিবার, নিজেতে প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রেষ্ঠ সাধনার অধিকার মানুষে বিস্তারিত করিয়া তাহাকে তাহার পরম অভ্যুদয়ে পৌছাইয়া দিতে আমি চাহি। ইহার ফলে জগতে যাহা ঘটিবে, তাহা অবিমিশ্র মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমি তোমাদিগকে উপাসনার কুলীনতম পদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি। আমি তোমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটী দিয়াছি, যাহা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ অন্যকে দিতে রাজি নহেন। আমি তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য যর্থার্থ ব্রাহ্মণ্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহা জাতিভেদ-শাসিত হিন্দু-শাস্ত্রজীবনের পক্ষে অসহ্য। কে বাধা দিলেন আর কে বিধি দিলেন, কে নিষেধ জানাইলেন আর কে সমর্থন করিলেন, এই ব্যাপারে আমি তাহার অনুসন্ধান করিয়াও সময় নষ্ট করিতে রাজি নহি। তোমরা প্রতিজনে সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ্য অর্জ্জন কর, ইহাই আমি চাহি। লক্ষ লক্ষ লোক যদি নিজ নিজ সাধনের বলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন, তবে তাঁহারা তখন সমাজের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

যে মন্ত্র শূদ্র-সন্তানেরা কাণে শুনিলে সেই কর্ণে তরল সীসক ঢালিয়া দিতে হইত, যেই মন্ত্র অব্রাহ্মণ-সন্তান উচ্চারণ করিলে তাহার রসনা ছেদন করিয়া ফেলা হইত, যে সাধনায় ব্রতী হইলে এক কালের রাজ্যদ্ধর-পুরুষ সাধকের প্রাণদণ্ড-বিধান করিতেন,

আমি সেই মন্ত্র, সেই সাধনা নির্ব্বিচারে তোমাদিগকে দিয়াছি। শুধু মন্ত্র দেই নাই, সকলে মিলিয়া সমবেত ভাবে উপাসনা করিবারও অধিকার দিয়াছি। যাহাতে পরমেশ্বরের উপাসনা-কালে দ্বিজ-চণ্ডালে একাত্ম হইয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় তোমাদের হাতে তুলিয়া ধরিয়াছি। আধ্যাত্মিক মার্গ হইতে জাতিভেদের স্বীকৃতিকে আমি নির্ব্বাসন দিয়াছি। আমার আপাতত ইহার অধিক কিছু করিবার নাই। অতঃপর যাহা করিবার, মহাকাল করিবেন।

দেখ, শুধু এই দেশেই নহে, সকল দেশেই এক একজন সাধক পুরুষ নিজ নিজ সাধন-লব্ধ শক্তির প্রভাবে কিছু কিছু লোককে নিজের মতানুবর্ত্তী করেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষাদানের ফলে এক একদল লোকের উপরে অপার প্রভাব বিস্তার করিবার প্রথাটা সম্ভবতঃ এই দেশেই বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু ইহার ফল কি? যে যেই মন্ত্রে দীক্ষা পায়, সে সেই মন্ত্রের দার্শনিকতায় প্রভাবিত হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট দার্শনিকতার মধ্যে মনের বারংবার আনাগোনার ফলে তদুচিত একটা মনোভঙ্গী এবং মনঃসংস্কার তাহার মধ্যে বদ্ধমূল হয়। এই দার্শনিকতা তাহার সমগ্র জীবনের কর্ম্মকে প্রভাবিত করে। মন্ত্রবলে কেহ রণভীত কাপুরুষ হয়, কেহ রণদুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসী সৈনিক হয়। আমি দিয়াছি তোমাদিগকে সর্ব্বসমন্বয়ের প্রেমমন্ত্র, আমি দিয়াছি তোমাদিগকে সর্ব্বমন্ত্রের উৎস-মন্ত্র, আমি দিয়াছি তোমাদিগকে সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতিমন্ত্র। এই মন্ত্রের স্বাভাবিক ব্যাপকতা তোমাদের জীবনকে

প্রভাবিত করিতে বাধ্য, যদি তোমরা মন্ত্রের সাধন কর। তাহাকেই আবার সমবেত ভাবে সাধন করিবার অধিকার ও প্রথা প্রদান করিয়া আমি তোমাদিগকে বিশ্বতোমুখ প্রসারের সাগর-সঙ্গমে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছি। তোমরা যদি মন দিয়া সাধন কর, তবে ইহাই আমার এক বিরাট বিপ্লবায়োজন, একথা বিশ্বাস করিও।

সমবেত উপাসনার আসরে আমরা প্রায় সকল স্থানেই একদিকে মহিলাদের এবং একদিকে পুরুষদের বসিবার আসন দেই। রহিমপুরে, ডিব্রুগড়ে, ফেণীতে এবং অন্যান্য বড় বড় অনুষ্ঠানে তাহা দেখিয়াছ। আমাদের দেশের সাধারণ রীতি হইতেছে মহিলাদিগকে বামার্দ্ধে বসিতে দেওয়া। শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে স্থলবিশেষে অন্যরূপও করা যায়। তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। নারী ও পুরুষের বসিবার স্থান একটু বিভিন্ন দিকে রাখা ভারতীয় শালীনতার অঙ্গ মাত্র। ক্ষুদ্রস্থানে অনেক সময়েই পৃথক্ ব্যবস্থা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া যেখানে কেহই সময়মত উপাসনায় আসে না।

সমবেত উপাসনায় প্রত্যেকেরই ঘড়ির কাঁটায় আসা উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময় হইয়া গেলেই উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। সমবেত উপাসনাকে ঝগড়া-কলহের আবহাওয়া হইতে একেবারে মুক্ত রাখিতে হইবে। সমবেত উপাসনায় তোমরা পরমেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিতে আসিয়াছ, পরমেশ্বরের সহিত তোমাদের কাহারও কোনও ঝগড়া-কলহ নাই। তাঁহাতে সম্যক্

আত্মনিবেদন হইলে অন্তর প্রেমে ডগমগ করিবে, তোমরা প্রেমে আত্মহারা হইবে। তখন আর পৃথিবীর কাহার সঙ্গে তোমরা কলহ করিবে? ভগবানকে যে পরমরত্মীয় করিয়াছে, বিশ্বের সকলে তাহার পরমাত্মীয় হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরের প্রেমে মজিয়া তোমরা তোমাদের সামূহিক উপাসনা সমূহকে সার্থক কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

বৃহস্পতিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

(১৩-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা নিলে মনের শান্তি সত্যই আসে, কারণ একটা নির্দ্দিষ্ট পথ পাওয়া যায়। দীক্ষার আগে মানুষ নানা পথে বিচরণ করে। ফলে একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে মন বসাইয়া অবিরাম এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একই সাধনা করিয়া যাওয়া আর হইয়া ওঠে না। কূয়া খুঁড়িতে হইলে এক জায়গাতেই মাটি কাটিতে হয়, আজ এখানে, কাল তিন বিঘা দূরের আর একস্থানে, পরশু শত মাইল দূরে গিয়া নিত্য নূতন মাটি কাটিলে কূয়া আর হইয়া ওঠে না, জল মিলে না।

দীক্ষা নিবার পরে সংসার তোমার কাছে আলুনি লাগিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। দীক্ষা নিবার পরে মন কতকটা অন্তর্মুখ হয় শুধু দীক্ষারই গুণে। তখন সংসারের প্রচলিত সুখগুলির প্রলোভনী শক্তি যেন কমিয়া যায়। কিন্তু দীক্ষা নিয়া যেই ভগবানের নাম করিতে যাইতেছ, সংসারটীও ত' সেই ভগবানেরই! সংসার তোমার নহে, ভগবানের,—এই ভাব লইয়া তুমি সংসারের সেবা কর।

নারীর পতিসেবা এক মহৎ কর্ত্তব্য। ঈশ্বর-সাধনেও পতিকে সাথী করিয়া লও। তাহা হইলে পতিসেবা সহজ হইবে, সুন্দর হইবে।

শরীর ভাল না থাকিলে কি সংসারী কাজ, কি সাধন-ভজন, কিছুতেই আনন্দ আসে না। কিন্তু দেহমাত্রেই ব্যাধিমন্দির। সুতরাং শরীরটার প্রতি-অঙ্গে মনঃসন্নিবেশন করিয়া কেবল চিন্তা করিতে থাক,—"ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি—আমি জগতের কল্যাণকারিণী হইতেছি।"

যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক যখন তুমুল সংগ্রামের মাঝে প্রবেশ করিবার আদেশ পায়, তখন কি সে এই চিন্তা করে যে, তাহার ঘাড়ে ব্যথা ছিল, কোমরে দরদ ছিল, পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে? এসব সে তুচ্ছ করিয়া সময়ের ঝাঁপাইয়া পড়ে, নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। তোমারও মনোভঙ্গী তদ্রূপ হউক।

পূর্ণ সুস্থ দেহ লইয়া চিরকাল জগতে কেহই বাস করিতে পারে না, কখনো কখনো দেহ রোগগ্রস্ত হয়। কিন্তু সুস্থ বা অসুস্থ

সর্ব্বাবস্থাতেই প্রতিটি দিনই বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম করিতে হয়। শরীর যখন অসুস্থ বোধ করিবে, তখন তাহার যোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে এবং শরীরকে ভগবচ্চরণে উপহার দিতে দিতে মনে মনে বলিবে,—"হে ভগবান্, ইহা তুমিই দিয়াছ, আবার তুমিই একদা লইয়া যাইবে, মধ্যবর্ত্তী কালে ইহাকে লইয়া কি করিতে চাহ, কর, তোমার উপরেই সকল ভার ছাড়িয়া দিলাম।" পরমেশ্বরে ভারার্পণ করিলে মনের এক বিচিত্র বিশ্রাম ঘটে। এই বিশ্রাম দেহের ও মনের সুস্থতা অতি দ্রুত ফিরাইয়া আনে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাজ সুরু করিয়াছ। কি আনন্দের কথা! অন্যেরা কেবল কথা আর কথাই কয়, প্ল্যানের পরে প্ল্যান আর পরামর্শের পরে পরামর্শই করে। তুমি বেশী কথা কহ নাই, এক দিনেই নিজের কর্ম্মের পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছ এবং কালবিলম্ব না করিয়া নির্দ্ধারিত সূচী অনুসরণ করিয়া কাজ চালু করিয়াছ। গণায় তোমরা

তিনজন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইলে তিনজনেই ত্রিশ জনের পৌরুষ প্রকাশ করিতে পারে, ঐক্যহীন হইলে ত্রিশজনের দ্বারাও তিন জনের কাজ হয় না। তোমরা যে কাজে নামিয়া গিয়াছ, আর থামো নাই, ইহাই তোমাদিগকে আমার বড় প্রিয় করিয়াছে। কাজটুকু বুঝিবার পরে আর সুরু করিতে দেরী করা সঙ্গত নহে। সুরু করিবার পরে আর থামাথামির বালাই নাই। আমি চাহিতেছি যে, কাছে ও দূরে, ছোট জায়গায় আর সুবৃহৎ জনপদে, সর্ব্বত্র কাজ সুরু হইয়া যাউক। ছোট ভাবেই হউক না, কাজে লাগিয়া থাকিলে দেখিবে ক্ষুদ্রারম্ভই এক সুমহতী ব্যাপ্তিতে ও ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী পরিণতিতে নিজের পূর্ণ রূপটী পাইয়া বসিয়াছে। ক্ষুদ্র একটী গ্রাম রহিমপুরে একদা আমি মৌনী হইয়া বসিয়াছিলাম। কাজ সুরু হইল। কুমিল্লা জেলার দুই শত খানা গ্রামে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হইল। ক্ষুদ্র রহিমপুরে অকল্পনীয় ব্যাপার সব ঘটিল। ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বই একমাত্র গুণ নহে, সে যে বৃহৎ হইলে হইতে পারে. ইহাও ক্ষুদ্রের এক মহৎ গুণ। অতএব ক্ষুদ্র একটী গ্রাম বা ক্ষুদ্র একটুকু সূচনা, এই দুইটীর একটীরও ক্ষুদ্রতাকে হেলায় অসম্মান করিয়া যাইতে পার না।

কাজ ধরিয়া কাজ ছাড়িতে নাই, লাগিয়া থাকিতে হয়। কেবল এই একটী নিষ্ঠায় তোমরা অটল থাক। কাজ সুরু করিয়া আর থামা হইবে না, কাজের প্রারম্ভ যত ক্ষুদ্রই হউক, কর্ম্মসূচনার স্থানটী যত তুচ্ছই হউক। সংখ্যায় তোমরা তিন কি চারির অধিক নহ, তবু আস্তে আস্তে কয়েকটা গ্রাম ব্যাপিয়া আলোড়ন,

আন্দোলন, উন্মাদন সৃষ্টি করিয়াছ। একদা তোমরা এই কয়জনে গিয়া তোমাদের অত বড় জিলা-শহরটীকে ভূমিকম্পের দোলা খাওয়াইয়া দিয়া আসিতে পারিবে।

কিন্তু এখন নয়নকে শহরমুখী হইতে দিও না। ভুলিয়া যাও যে, কাছেই একটা বড় শহর আছে এবং সেখানে তোমাদের বেশ কয়েক শত গুরুভাই-বোন্ আছে। তাহারা কাজ করে না, কথা বলে, আলোচনা করে, সময় সময় কলহ করে, মনোমালিন্য বাঁধায়। তাহাদের চিন্তা মন হইতে এখন একেবারেই তুলিয়া দাও। তুমি তোমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই গভীরতম খনন-কার্য্য চালাও, পাতালপুরী হইতে পাতাল-গঙ্গাকে টানিয়া আনিয়া মর্ত্ত্যের মরুভূমিতে জলসিঞ্চন কর, তাহারই বুকে এমন মহীরুহের সৃষ্টি হউক, যাহার শাখাপ্রশাখা স্বর্গপুরীকে ভেদ করিয়া অনন্ত ঊর্দ্ধে অভিসার করিবে। গ্রামের মাটিকে খাঁটি জানিয়া তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ গ্রামে প্রতিটি আত্মার উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর। তারপর দশটি গ্রাম মিলিত হইয়া এক একটী জনপদে সূরু করিবে অভিযান পরিচালন, একটী অভিযান করিয়াই তোমরা থামিয়া যাইবে না, মোগল-পাঠানেরা যেমন করিয়া দুঃসাহস সহকারে একটীর পর একটী করিয়া পশ্চিম ভারতে অভিযান প্রেরণ করিয়ছিল কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া, তেমন দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ব্বার অভিযান নিয়া তোমাদের যাইতে হইবে শহরগুলিতে। শহরের মানুষ পাকা দেওয়ালের অন্ধকারে পড়িয়া ঘুমায়, ইহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইবেই, ইহা জানা কথা। আমার কর্ম্মনীতির একটা

মোটা কথা এই যে,—গ্রাম আগে, সহর পরে। জীবন ভরিয়া আমি তাহাই করিয়াছি। দৃষ্টান্ত, পুপুন্‌কীতে আমি জীবনের পরমায়ু একচল্লিশটী বৎসর ধরিয়া ক্ষয় করিয়া চলিয়াছি কিন্তু নিকটতম সহর উত্তরে ধানবাদ আর দক্ষিণে পুরুলিয়ার জনসাধারণ আমাকে চেনে না।

তোমরা যে কাজ তোমাদের গ্রামটীতে করিতেছ, তাহার বিবরণ সঙ্গীয় তালিকার প্রত্যেক ঠিকানায় প্রেরণ কর। তাহারা জানুক যে, ছোট ভাবে ছোট স্থানে অল্প লোক লইয়া কাজ সুরু করিলেও সে কাজে নিত্য নূতন আত্মপ্রসাদের আস্বাদন পাইবার সুযোগ ঘটে। মানুষের তোমরা উপকার করিতেছ, এইরূপ অহঙ্কার রাখিও না, জানিও, মানুষ তোমাদের সেবা প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করিতেছে, ইহাতেই তোমরা ধন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ
গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কেহ কোথাও প্রশংসনীয় কার্য্য করিলে অকুণ্ঠ যশ তাহার প্রাপ্য হয় কিন্তু ইহাতেই তাহার সৎকর্ম্মের প্রকৃত সার্থকতা সাধিত

হয় না। তাহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া চারিদিকে ছোট-বড় সকল স্থানে ছোট-বড় সকল কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও নারীরা কাজে লাগিয়া গেলে তবে তাহার এই শ্রমের, এই ত্যাগের, এই পরমায়ু-ক্ষয়ের সার্থকতা।

তোমাদের মধ্যে কোথাও কোথাও কেহ কেহ অপ্রত্যাশিত সাত্ত্বিকতার সহিত অসাধারণ জনসেবা করিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া আমরা তাহা প্রচার করি না বা প্রকৃত কর্ম্মীরা এই বিষয়ে প্রচার চাহেও না। কিন্তু তোমরা ত' পরোক্ষভাবে তোমাদের কৃতী ভাইবোনদের সুকীর্ত্তির সংবাদ কিছু-না-কিছু পাইয়া যাইতেছ! তাহারা যাহা এক স্থানে করিতেছে, তোমরা তাহা শত শত জনে শত শত স্থানে কেন করিবে না? অপরকে প্রশংসা করিলেই তোমার দায়িত্ব-মোচন হয় না, তাহার যেটুকু অনুকরণযোগ্য ও অনুকরণসাধ্য, তাহা সর্ব্বজীবহিতার্থে তোমাকেও করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ
গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্রলেখা একটা বিরাট কাজ। যে আমার ঘরের বাহিরে দুই ঘণ্টা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে শুধু একটু চখের দেখা দেখিবার জন্য বা মুখের একটা কথা শুনিবার জন্য, এক এক জন পত্র-লেখককে সেই ব্যক্তির সহিত তুলিত করা যায়। তাহার পত্রখানার জবাব দিলে সে কৃতার্থ হইবে, হয়ত উপকৃত হইবে, হয়ত জীবনের এক কঠোর ও কুটিল সমস্যার গ্রন্থিল জট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবে। সুতরাং পত্র পাইলেই আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে চেষ্টা করি। অনেক সময়ে আমার এই দ্রুততাকে কেহ কেহ বিস্ময়কর মনে করিয়া থাকে।

কিন্তু পত্র লিখিতে সময়ও ত' লাগে। কোনো পত্র বড় হইবে, কোনো পত্র ছোট হইবে কিন্তু সময় টানিয়া নিবে। টানাটানি করিয়াও চব্বিশ ঘণ্টার দিনটাকে আঠাশ ঘণ্টায় পরিণত করিতে পারি না, অথচ দিনের সাত আট ঘণ্টা সময় সাধারণতঃ পত্র লিখিতেই কাটিয়া যায়। আমার অন্য কাজও ত' আছে। অন্যান্য কাজে আমাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম দিতে হয়, তাহাতে অনেকে অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আপনি পত্র লেখেন কখন?" তাঁহারা ত' জানেন না যে, রাত্রি তিনটা হইতে আমার অবসর ও বিশ্রামের অবসান সুরু হয়। পত্র লিখি ঝড়ের বেগে, লিখিয়া আর একবার পড়িবার অবকাশ পাই না, নামটী স্বাক্ষরের পরে সঙ্গে সঙ্গে খামে আঠা লাগাই এবং প্রথম-প্রাপ্য ডাকে তাহা রওনা করি। পত্র লেখাকে আমি একটা দারুণ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান

করি। হায় রে, তথাপি হাজার হাজার পত্র জমিয়া যায়, বস্তাবন্দী হইয়া তাকে ওঠে, একবার না পড়িয়া সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলি কি করিয়া? বলাই বাহুল্য যে, কাহারও পত্র আমি সহজে ছিঁড়ি না, প্রত্যেকখানা পত্রকে আমি আমার গৃহে অভ্যাগত সম্মানিত অতিথি বলিয়া মনে করি।

কেহ হয়ত লেখে, একটী মেয়েকে বশীকরণ করিয়া দিতে হইবে, কিম্বা ডার্বি লটারীর প্রথম পুরস্কারটী পাওয়াইয়া দিতে হইবে, অথবা প্রতিবেশী একজনের পুত্রকে বাণ মারিয়া বধ করিয়া দিতে হইবে। এই সব পত্রকেও আমি নিঃসঙ্কোচে ছিঁড়িয়া ফেলি না। অবসর পাইলে ইহাদিগকে কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া পত্রোত্তর দেই। তবে, নিতান্ত অক্ষম-স্থলে এই সব পত্রের কতকগুলি ছিন্ন কাগজের বাস্কেটে যায়। আগে সেগুলি আস্তা-কুঁড়েতে ফেলিয়া দেওয়া হইত, অসীম তাহা ছেঁড়া-কাগজ-ক্রেতার কাছে বেচিয়া মালটিভারসিটির জন্য কখনো দশ পয়সা, কখনো বিশ পয়সা অর্জ্জন করে।

আমার পক্ষে পত্র লেখা একটা দায়িত্ব। যে আমাকে পত্র লিখিল, তাহার জীবন-সমস্যার সমাধান যদি পত্রে সম্ভব হয়, তবে তাহা করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। একদা তরুণ যৌবনে সহস্র সহস্র অপরিচিত কিশোরদের নিকটে ঘুম ভাঙ্গাইবার গান গাহিয়া পত্রের পর পত্র লিখিতাম, তাহা বিফল হয় নাই। আজ যদিও গানের সুর আলাদা, তবু একই কণ্ঠের

একই রাগিণী বাজিতেছে। পত্র লিখি, না, কর্ত্তব্য-সম্পাদন করি।

কিন্তু আমি যদি শুধু পত্রই লিখি আর তোমরা যদি কোনও কাজই না কর, তবে এই পত্র-লিখন-কলা একটা বিলাসিতায় পরিণত হইয়া যায়। অনেকের যেমন বক্তৃতা শোনা একটা বিলাস, তোমাদেরও পত্রের জবাব পাওয়া একটা বিলাস হইয়া গেলে পত্র আর লিখিব কেমন করিয়া? অকারণে পত্র লিখিয়া আয়ুঃক্ষয় করার ত' কোনও মানে হয় না মা।

তুমি বিবাহিতা হইয়াছ, নূতন একটী সংসারে প্রবেশ করিয়াছ। নূতন লোকদের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া জীবন যাপন করিতেছ। আনন্দের কথা। কন্যা হইয়া জন্মাইলে অধিকাংশকেই স্বামি-গৃহে যাইতে হইবে, শ্বশুর-কুলের গুরুজনদের সেবা করিতে হইবে, অনুজদিগকে স্নেহ দিতে হইবে, ভালবাসার একটা অপরূপ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের অন্তর আনন্দে উচ্ছল করিতে হইবে, বিষণ্ণ সংসারে হাসি ফুটাইতে হইবে। কিন্তু মা, বিবাহের পূর্ব্বেই দীক্ষাসূত্রে যে উচ্চ আদর্শবাদ পাইয়াছ, স্বামিগৃহে তাহাকে প্রচারিত, প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাটুকুও সঙ্গে সঙ্গে করিতেছ ত'? স্বামী তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়াছে, তাহাকে তোমার আদর্শবাদের অনুপ্রেরণায় প্রভাবিত তুমি কেন করিবে না বা কেন করিতে পারিবে না? একটা মহাভাব একটা মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহাই ত' ইহার শেষ নহে, এই মহাভাব সংসারের প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়-মন আপ্লাবিত বিপ্লাবিত করিয়া

তাহাদের দ্বারাই এই মহাভাবের সম্প্রসারণ-কার্য্য পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত রাখিবে, ইহাই ত' প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছ কি?

তোমাদের একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, এই শিশু দীর্ঘায়ু হইয়া যশস্বী হউক এবং জগতের মঙ্গলকর্ম্মে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া দিগ্বিদিকে দৃষ্টান্তস্থানীয় বলিয়া পরিপূজিত হউক। তোমার পুত্র তোমাদের স্বামী ও পত্নীর পূর্ণ মিলন সাধনের সেতু কিন্তু আমি চাহি, সে যুগযুগব্যাপী আদর্শবাদের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ-চেষ্টার একটা জাগ্রত, জীবন্ত, জ্বলন্ত বিগ্রহ হউক। গৌরবান্বিত অতীতের সহিত ততোঽধিক গৌরবসম্পন্ন ভবিষ্যৎকে যুক্ত করিয়া দিয়া তোমার পুত্র একটী সেতুবন্ধের সূচনা করুক, যাহা একটী মাত্র সেতুতেই পর্য্যবসিত হয় না, যাহা বাস্তবে একটী সেতু-পরম্পরা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চিরকৌমার্য্যেচ্ছু অবিবাহিতেরা বিবাহিত পুরুষদের সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করুক, সাধারণতঃ লোকহিতকামী সদ্গুরু-বর্গের ইহা অনুমোদিত নহে। বিবাহিত ব্যক্তির জীবনের গূঢ় অংশে এমন অনেক তথ্য থাকে, যাহা চিরকুমারের জানায় কোনও লাভ নাই, বরং হয়ত ক্ষতিই আছে। কিন্তু যেই সকল বিবাহিত ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনকে ভোগের সোপান রূপে গ্রহণ না করিয়া উন্নততর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে যত্নবান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গ ও সৌহৃদ্য চিরকুমারেরও জীবনে বলবিধায়ক হইতে পারে। অতএব বিবাহিত ব্যক্তিদের সহিত অন্তরঙ্গ হইবার কালে এই বিষয়টীতে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

শনি, রাহু, কেতু কাহাকেও ভয় করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। ভয় কর শুধু অধর্ম্মকে, অন্যায়কে, পাপকে। এইগুলি হইতে দূরে থাক। তথাকথিত শনি, রাহু, কেতু তোমার দিবা শক্তির নিষ্পেষণে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া চীৎকার করিবেন। যেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ঐ সকল অপনাম দিয়া তোমার চিরানিষ্টকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারা কেহই তোমার শত্রু নহেন। অকারণ আক্রোশ বশতঃ তাঁহাদিগকে সকল কৌলিন্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাদের নামে কলঙ্ক রটনা করা হইয়াছে। আস্তে আস্তে চলিতেন বলিয়া ইনি শনৈশ্চর। আস্তে চলা সকল সময়েই দোষ নহে। রমণসুখ লাভের চেষ্টায় বিরত হইয়া ইনি ব্রহ্মচারীর যতি-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার পত্নী ইঁহাকে ক্রোধান্ধ হইয়া

অভিশাপ দিয়াছিল। ইঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেহ বিচার করিল না, পত্নীর ক্রুদ্ধ অভিশাপকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল এবং প্রচার করিল এক ভ্রমান্ধ সমাজ। গুরুপত্নীগামী চন্দ্রকে কেহ এইরূপ কলঙ্কী বলিয়া মনে করিল না, গুরুপত্নীগামী ইন্দ্রকে কেহ পূজার অনুপযুক্ত মনে করিল না, দারসুখ-ত্যাগহেতু শনি সকলের ভীতির পাত্র হইলেন, ব্রহ্মচর্য্যমূল ভারতীয় সমাজে ইহা এক বিচিত্র প্রহেলিকা।

রাহু আর কেতু কোন্ দোষ করিয়াছিল? যেই অমৃত আহরণের জন্য ইহারা দেবতাদের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করিয়াছে এবং বাসুকির মুখটার দিকে থাকায় অবিরাম সর্পবিষে আচ্ছন্ন হওয়ার ক্লেশ সহিয়াছে, সেই অমৃত হইতে ইহাদিগকে কৌশলে বঞ্চনা করিবার কালে ইহারা ফাঁকতালে একটু অমৃত খাইয়া ফেলিয়াছিল। দেবাসুরের যুগ্ম পরিশ্রমে যাহার প্রাপ্তি, বণ্টনের বেলা তাহাতে বঞ্চনা পূরাপূরি টিকিল না বলিয়া দেবতাদের আক্রোশে এই দুই নিরপরাধ দৈত্য চিরকালের জন্য মনুষ্যসমাজের পরমশত্রু বলিয়া কুকীর্ত্তিত হইল। দেবতাদের কুৎসা-পরায়ণতা ইহাদিগের এই কুৎসিত অপমূর্ত্তি লাভের একমাত্র কারণ। ইহারা ইন্দ্রের বা চন্দ্রের মত অতি গর্হিত কুকার্য্য কিছু করে নাই।

শনি, রাহু, কেতু কাহারও কোনও গরজ পড়ে নাই তোমার ক্ষতি করিবার। তোমার ক্ষতি ত' তুমিই নিয়ত করিতেছ। লোভ দূর করিতে না পারিয়া, লালসার অধীন হইয়া, কখনো বা ভয়ের

বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিয়ত অসঙ্গত কার্য্য করিতেছ। তোমার এই আতুরতাই তোমার শত্রুতা করিতেছে। তোমার এই লোভাতুরতার দোষ, লালসাতুরতার দোষ, ভয়াতুরতার দোষ ইহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া শুধু ইহাদেরই অসম্মান করিতেছ না, নিজেরাও অসম্মান কুড়াইতেছ। খ্রীষ্টানের শনি নাই, মুসলমানের রাহু নাই, ইহুদীর কেতু নাই, তবু ইহাদের মধ্যে অনেকে এক অপশক্তি শয়তানকে দোষী করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেছে। আসল শয়তান যে নিজের অলস, পঙ্গু, বিভ্রান্ত, বিপ্রমাদী মন, একথা না বুঝিলে সবই বৃথা।

মনকে শাসন কর এবং বাঘের ভয় দূর কর। কামিনী তাহার নিকটেই বাঘিনী, যে মনকে শাসন করিতে পারে নাই। একাজ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। মনকে শাসন করাই বড় কথা। একাজটী করিতে সমর্থ হইবার জন্যই গুরুকৃপা পাইয়াছ।

মনকে স্থায়ী ভাবে শাসন করিতে হইলে তাহাকে পশুভাব হইতে দিব্যভাবে উন্নীত করিতে হয়। যেই মনটী একদা পঙ্কিল পল্বল ছাড়া আর কিছু ভালবাসিতে না, সেই মনের ভালবাসার গতি, রুচি ও লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার নামই দিব্যায়ন। এই দিব্যায়নের জন্যই দীক্ষা নিয়াছ, মনকে মারিয়া ফেলিবার জন্য নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
শনিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কাজ না করিতে করিতে যাহাদের হাতে পায়ে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জোর করিয়া কাজে নামাইয়া দাও। সেনাধ্যক্ষ যেমন করিয়া শান্তির সময়েও সৈন্য-মণ্ডলীকে প্রাত্যহিক কুচ-কাওয়াজে রাখে, তোমরাও তোমাদের প্রতিটি গুরুভাই ও ভগিনীকে সারা বৎসরই কিছু না কিছু এমন কাজে লাগাইয়া রাখ, যাহা তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবীর বাহিরে। শুধু নিজেকে লইয়া থাকিতে থাকিতে মানুষ বড়ই সঙ্কীর্ণচেতা ও নীচবুদ্ধি হইয়া যায়। এই মারাত্মক ক্ষতি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

উচ্চ আদর্শবাদকে ভিত্তি করিয়া তোমরা কাজ করিবে। সাময়িক কোনও বিশেষ স্বার্থের সিদ্ধি তোমাদের কাম্য হইবে না। তোমরা চিরন্তন ঋদ্ধির পথে জগৎকে পরিচালন করিবে। —ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কর্ম্মস্থলে সকল সময়ে বা সকলের সহিত উদার হওয়া যায় না, কারণ জগতে ছলনা, কপটতা, ও খলতার একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতেছে। কিন্তু যাহাই যখন কর, তাহার

পশ্চাৎপটে থাকা চাই দিগন্ত-বিস্তৃত প্রেমময় উদার একটী হৃদয়, ক্ষমাশীল, সমবেদনাপূর্ণ, সহানুভূতিপ্রবণ একটী প্রাণ। তুচ্ছতার সহিত মিত্রতা, হেয়তার সহিত কুটুম্বিতা, পাপের সহিত আপোষ, অন্যায়ের প্রতি প্রশ্রয়দুষ্ট দৃষ্টি—এইগুলি হইতে তোমাকে মুক্ত থাকিতে হইবে। যেই যুগে বাক্‌স্বাধীনতা আছে বলিয়া শুনি কিন্তু স্বাধীন ভাবে কথা কহিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত অনেকের নাই, সেই যুগে সাহস পূর্ব্বক কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে।

আমি তোমাদের প্রতিজনকে অনুক্ষণ স্মরণে রাখিয়া থাকি। আমি তোমাদের নিত্যসঙ্গী, নিত্যসাথী, নিত্যসারথি থাকিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। তোমাদের দুঃখে, বিপদে, দুর্দ্দিনে, দুর্দ্দৈবে আমি তোমাদের ভুলি না। যে আমাকে স্মরণ রাখে, তাহাকে আমি জীবনের প্রতিপদবিক্ষেপে সত্য, সরলতা ও পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করি। আমার কোনও অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, অলৌকিক বা অসাধারণ শক্তি নাই। আমি তোমাদের মত সাধারণ মানুষ রহিয়াও তোমাদিগকে নিয়ত কল্যাণে, কুশলে, পূর্ণতায় আকর্ষণ করি। রশ্মি আমার ভালবাসা। ভালবাসিয়াই আমি কৃতার্থ, ইহার প্রতিদান কাহারও কাছে কদাচ চাহি না। তোমরা প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
শুক্রবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(১৪-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তুমি সুখী হও, সমদর্শী হও, সর্ব্বজীবহিতকারী হও।

সুখী হইতে হইলে শান্তি পাইতে হয়। শান্তি আসে ঈশ্বরে বিশ্বাস হইতে, ঈশ্বরে নির্ভর হইতে, একান্ত ঈশ্বরগতপ্রাণতা হইতে। ভোগ্য, ভোজ্য, যশস্য বস্তুর প্রাপ্তির ভিতরে উৎফুল্লতা থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তি উহাতে নাই। শান্তি আসে সন্তোষ হইতে, সন্তোষ আসে পরমেশ্বরে একান্ত নির্ভর হইতে। শাকান্ন খাইয়াও একজন শান্তিতে থাকিতে পারে, পলান্ন ভোজন করিয়াও একজনের পক্ষে শান্তি সুদূরপরাহত হইতে পারে। যখন বলিতেছি, সুখী হও, তখন শুধু ইহাই বলিতেছি না যে, তোমার দেহ-মন-প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার উপকরণগুলি লাভ করিয়া তুমি উৎফুল্ল হও, পরন্তু অতিরিক্ত ইহাও বলিতেছি যে, প্রাপ্তি- অপ্রাপ্তি-নিরপেক্ষ ভাবে তুমি বিমল, বিপুল, শান্তিরও অধিকারী হও।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তুমি সমদর্শী হও। কি করিয়া হইবে? সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে, উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝখানে সর্ব্বত্রই কেহ ছোটর কেহ বড়র পীড়ি পাইতেছে। সবাই সমান হইতে পারিতেছে না। এমন কি, সকলকে সমান করিবার জন্য যাহারা বেপরোয়া ভাবে মানুষের মেদ-রক্তে মেদিনী ক্লেদাক্ত করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও দুই এক জন বড় থাকিয়া যাইতেছে, অপরেরা ছোট, অনেকে ছোটরও ছোট হইয়া পড়িতেছে। চখের উপরে একজনকে উঁচু, একজনকে নীচু দেখিতে পাইতেছ, এমন অবস্থায় সমদর্শী হইবে কি করিয়া? প্রত্যেকের ভিতরে পরমেশ্বরের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব উপলব্ধি একটা কথার কথা নহে। এই উপলব্ধি লাভ করিতে সাধনার প্রয়োজন।

সেই সাধনাই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। কে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছ আর কে জন্মিয়াছ অন্ত্যজের গৃহে, তাহার আমি বিচার করি নাই। আমি দেখিয়াছি তোমরা মানুষ। আমি জানি, মানুষ দেবতারও শ্রেষ্ঠ। এই মানুষকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাধনার অধিকার বিতরণে এই জন্যই আমার মনে কণা মাত্র কুণ্ঠা জাগে নাই। ভগবানকে ডাকিবার অধিকার প্রত্যেকের কিন্তু কে কিভাবে ডাকে?

"হে ভগবান্, আমার বিপদ বিনাশ কর, আমার সঙ্কট মোচন কর, কিন্তু আপদউদ্ধারের পরে আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব," —ইহা শূদ্রের লক্ষণ।

"হে ভগবান্ আমাকে বাঁচাও, আমি তোমার মন্দির গড়িব, তোমার বিগ্রহ স্থাপন করিব, ষোড়শোপচারে জোড়া মহিষ বলি দিয়া তোমার পূজা দিব,"—ইহা বৈশ্যের লক্ষণ।

"হে ভগবান্, আমি তোমার পূজা দেই আর নাই দেই, আমি তোমার প্রচার করি আর নাই করি, তোমার কৃপা পাইবার আমার অধিকার আছে, কেন না আমি নিজেই আমাকে সৃষ্টি করি নাই, তুমিই করিয়াছ। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়া আমার জীবনের সাফল্যের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়াছ। আমাকে উদ্ধার কর, তোমার দায়িত্ব পালন কর,"—

"হে পরমেশ্বর, আমি তোমাকে জানিয়াছি, আমি তোমাকে চিনিয়াছি, আমি তোমাকে দেখিয়াছি অনলে চিরনভোনীলে। আমি তোমাকে দেখিয়াছি তস্করে আর দাতায়, দস্যুতে আর ত্রাতায়, গণিকায় আর পতিব্রতায়, মিথ্যাচারীতে আর সত্যশীলে, প্রবঞ্চকে আর পরার্থে সর্ব্বস্ব উৎসর্গকারীর অনবগুণ্ঠিত সরলতায়। তুমি সর্ব্বত্র, তুমি সর্ব্বদা, তুমি সর্ব্বার্থে, তুমি আমার একার নও।"—ইহা ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণের বহু লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু উপরি উক্ত লক্ষণটী না থাকিলে অপর সকল লক্ষণই বৃথা।

সমদর্শী হইয়া জগতের ইতর জাতির, ইতর প্রকৃতির, ইতর আচরণের লোকগুলিকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের পথে টানিয়া আনিয়া ইহাদের নবজন্মান্তর ঘটাইয়া ধরিত্রীকে পাপমুক্ত, কলুষরিক্ত, প্রেমাভিষিক্ত কর। সমদর্শী না হইলে প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রেমিক না হইলে সমদর্শিতা আসে না। প্রেমিকই প্রকৃত প্রজ্ঞাচক্ষু। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষই প্রেমিক। সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করিব না, কেবল

বলিব "ছুঁইওনা, ছুঁইওনা" আর নিজেকে মনে করিব আমি প্রেমিক হইয়াছি, ইহা এক চমৎকার আত্মপ্রবঞ্চনা। কেন ছুঁইব না? নিকৃষ্ট বলিয়া। বেশ ত', এস না সকলে মিলিয়া ইহার নিকৃষ্টতা নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন, তাহা করি। সোনার কৌটাটা বিষ্ঠাস্তূপে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উহাকে তুলিয়া আনিব না? উহার অশুচিতা বিদূরিত করিতে হইবে, উহাকে তুলিতে গিয়া আমার যে অপবিত্রতাটুকু ঘটিয়াছে, তাহাও তপস্যার বলে নিশ্চিহ্নই করিয়া দিতে হইবে। তপস্যাকে মনোগঙ্গা নাম দিতে পার। স্বর্গের গঙ্গা, পাতালের গঙ্গা, মর্ত্ত্যের গঙ্গা যে পাপ হরণ করিতে অসমর্থা, মনোগঙ্গা তাহা হরণ করিবেন।

তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, তুমি অব্রাহ্মণ সন্তানকে ব্রাহ্মণের তপস্যা করিতে দিবে না। কেন? তোমার ব্রাহ্মণ্যের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য। প্রস্তাব সাধু। কিন্তু বিশ্বামিত্র যে ব্রাহ্মণ হইলেন, লাভটা কাহার হইল? ক্ষত্রিয়ের ত' কেবল আফশোষ করিবার রহিল, "হায় বিশ্বামিত্র, তোমাকে আমরা হারাইলাম।" বিশ্বামিত্র একাই ব্রাহ্মণ হইলেন, তাহা নহে, তাঁহার কোনও কোনও পুত্র আর ক্ষত্রিয় হইল না। তাহারা ব্রাহ্মণ-বংশের বিবর্দ্ধক হইল। বিশ্বামিত্রকে দিয়া গৌরব বোধ করিবেন না, এমন ব্রাহ্মণ ভূমণ্ডলে কে আছে? বলা হয়, আমাদের বর্ত্তমানে-প্রচলিত ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র নাকি বিশ্বামিত্রেরই দিব্যদর্শন। বলা হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যে ব্রহ্মগায়ত্রী পর পর দর্শন করিয়াছিলেন,

কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ্যের পরম অবলম্বন বর্ত্তমানে-প্রচলিত ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র বিশ্বামিত্র ঋষি দর্শন করেন।

উদার হইয়া ছোট, নীচ, চির-অনাদৃতদিগকে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ সংস্কার, উচ্চ রুচি, উচ্চ সাধনা ও উচ্চ সংস্কৃতি দিয়া সমগ্র ধরণী ব্রাহ্মণে ভরিয়া দেওয়া যায় কি না, তাহা তোমরা দেখ। সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিবার তপস্যা তোমরা গ্রহণ কর। যাহাদের ছোটলোক বলিয়া বলা হয়, তাহাদিগকে শুধু খিচুড়ি খাওয়াইয়া বিদায় করিবে আর যাহাদিগকে বলা হয় বড়লোক, তাহাদের জন্যই পায়েস, মালপোয়া, কাঁচাগোল্লা, দধি ও সন্দেশ রিজার্ভ থাকিবে, ইহা তোমাদের কেমন-ধারা উৎসব? এই উৎসবে কাহার প্রাণের ফল্গুধারা প্রখর বেগে উৎস হইয়া স্ফুরিত হয়? কাহারও জাতিভেদ-সংস্কার আমি ভাঙ্গিতে আসি নাই, কাহাকেও জাতিসংস্কারের কাঠগড়ায় আমি বলি দিতেও আসি নাই। আমি আসিয়াছি, মানুষের দেবত্বকে স্বীকৃতি দিতে, তাহার ভিতরের সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাইতে। যাঁহারা সমাজে জাতিভেদ রাখিবার পক্ষে, তাঁহারা রাখুন, যাঁহারা ভাঙ্গিবার পক্ষে, তাঁহারা ভাঙ্গুন—আমি এই দুই দলের একটী দলেও নাই। আমার প্রেম আমাকে মানুষ মাত্রের অভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মকে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে,—আমার ধ্বনি "মানুষের জয় হউক।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ বিট্রাগুণ্টা (অন্ধ্রপ্রদেশ)
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৫
(১৮-৬-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কবিতাটী পাইলাম। বিষয়বস্তু চমৎকার। নিয়ত এইরূপ উন্নত চিন্তার অনুশীলনে থাকিলে ক্রমে ক্রমে মনের পূর্ব্বসঞ্চিত আবর্জ্জনা ও পূতিগন্ধময় কুসংস্কার দূর হইয়া যাইতে থাকে এবং মনের চিরাভ্যস্ত অন্ধকার পরিবেশের ভিতরে স্বচ্ছ আলোর বিকীরণ ঘটিতে থাকে। ফলে একদা যাহা ছিল কদভ্যাস-নির্জ্জিত অজ্ঞানতার অন্ধকূপ, তাহা ক্রমশঃ জ্যোতিরুদ্ভাসিত জ্যোৎস্নাহসিত কোটিনক্ষত্রখচিত সুনীল উদার আকাশের ন্যায় বিরাট ব্যাপক সুন্দর এক অত্যাশ্চর্য্য লীলাভুমিতে পরিণত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুমি তখন স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতির সহিত একাত্ম ও অভিন্ন হইয়া নিজেতেই নিজের পরমরসের আদরণীয় সামগ্রী আস্বাদন করিবে এবং কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ তৃপ্তি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। এই যে পরমা পরিতৃপ্তি, ইহার কথাই নানা ভাষায়, নানা সংজ্ঞায়, নানা তর্ক-বিচার-বিতণ্ডায়, নানা ভাবে রসে মাধুর্য্যে, নানা বিচিত্র আলোচনায় ও গবেষণায় সর্ব্ব-শাস্ত্র, সর্বসন্তগণ, সকল জ্ঞানী, সকল ভক্ত, সকল কর্ম্মবীরেরা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,

করিতেছেন এবং অনন্তকাল ধরিয়া করিবেন। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে ইহাই করিয়াছেন বর্ণনা, মহেশ্বর পঞ্চমুখে ইহারই দিয়াছেন ব্যাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মোহন-মুরলী লইয়া ইহাই করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন শাশ্বতকাল গান।

লিখিতে বসিবার কালে নিজেকে বাহিরের লোকের কাছে জাহির করিবার বিষয়ে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী হইও না। সেইরূপ আগ্রহ বা গোপন ইচ্ছা থাকিলে নির্ম্মম ভাবে তাহা মন হইতে সমূলে তুলিয়া ফেলিবে। নিজেকে নিজে চিনিবার জন্য, নিজের অন্তর্নিহিত সম্পদরাশির পরিচয় নিজেই পাইবার জন্য লিখিবে, অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

স্ত্রী-সহবাসের প্রবৃত্তি কমাইতে হইবে। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে যাহাতে নিষ্কাম প্রেম বাড়িতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দেহের সহিত দেহকে সংযুক্ত করিয়া আর কতটুকু আপন হইবে বা কতটুকু আপন করিবে? আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইতে হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দাম্পত্য আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিলে তোমার অন্তরের অনেক গুপ্তশক্তির উৎস-মুখ হঠাৎ একদিন খুলিয়া যাইবে। সেখানে তোমার জন্য কত বল, কত বীর্য্য, কত শৌর্য্য, কত পৌরুষ, কত প্রতিভা আবহমান কাল হইতে যে সঞ্চিত ছিল, তাহা দেখিয়া হঠাৎ একদিন চমকিত হইয়া যাইবে। প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যকে যে জীবনের ভিত্তিতে বসাইয়াছিলেন, তাহা একটা আজগুবি

খামখেয়ালীতে নহে। তাহার পশ্চাতে যুক্তি আছে, তথ্য আছে, যোগ্য কারণ রহিয়াছে। তোমরা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে নিজ নিজ জীবনের সীমিত পরিসরে যে যতটুকু পার সম্মানিত আসন দিতে চেষ্টা কর। বিবাহিত হইয়াছ বলিয়াই ভাবী কালের মানুষের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব কমিয়া যায় নাই।

চিরকাল যাহারা সাধ্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে অহোরাত্র বা চৌষট্টি প্রহর কীর্ত্তন করিয়া গলা ভাঙ্গিয়াছে আর প্রাণপণে খিচুড়ী খাওয়ার বেপরোয়া অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের মনে দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যবোধ, যুগোপযোগী তৎপরতা জাগাইতে আলস্য করার মানে হইতেছে মধ্যযুগের অন্ধকারে পড়িয়া থাকা। তোমরা নামকীর্ত্তনাদির আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর এবং নিজের অন্তরকে পরমেশ্বরের নামে যুক্ত করার চেষ্টাকে যতটা সম্ভব অকারণ আড়ম্বর হইতে মুক্ত রাখ।

কর্ত্তব্য কি জানিবার পরে জল-ঝড়-বাদল-বজ্র-বন্যা-মহামারী-ভূকম্প-দাঙ্গা কিছুতেই গ্রাহ্য করা চলিবে না। তোমরা ঘরে ঘরে গিয়া হরিওঁ নাম-কীর্ত্তন করিয়া মানুষের কাণে এমন মধু বর্ষণ কর, যেন এই মধুর আকর্ষণে তাহারা প্রত্যেকে পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামের প্রতি রুচিসম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক প্রচার-সংগঠন-কারীরা যেরূপ নিষ্ঠায় ও যেরূপ ব্যাপকতায় নিজ নিজ মত বা idiology মানুষের মনের ভিতর গুঁজিয়া দিবার জন্য বিপুল পুরুষকার সংঘবদ্ধভাবে প্রয়োগ করে, তোমরাও

তাহা করিবে, করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইও না। তবে, ভোট সংগ্রহ তোমাদের লক্ষ্য হইবে না, তোমাদের লক্ষ্য হইবে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধিকে নিজের স্বচ্ছন্দ গতির মধ্য দিয়া জীবন-যাত্রার ও ঈশ্বরোপাসনার সব চেয়ে নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ পন্থা বাছিয়া লইবার সুযোগ দান। মানুষ আনিয়া নির্ব্বিচারে নিজের দল বাড়ানোর তোমাদের লক্ষ্য হইবে না, তোমাদের লক্ষ হইবে মানুষমাত্রের বল বাড়ানো,—চিন্তার বল, ধারণার বল, প্রেরণার বল, সাধনের বল, পন্থার নিষ্কলঙ্কতার বল আর চরিত্রের নির্ম্মলতার বল। জগদ্বাসী কাহার বল কতটুকু কি ভাবে বাড়াইতে পার, তাহাই তোমার অনুসন্ধেয় হউক।

আমি হেঁয়ালির জাল ছড়াইতেছি না, আমি তোমাদিগকে স্বানুভবলব্ধ সত্য শুনাইতেছি। মানুষকে ডাকিলে সে কাছে আসে,—তোমরা কাহাকেও ডাকিয়াছ কি? মানুষকে কথা শুনাইলে সে কাণ পাতিয়া শোনে,—তোমরা কথা শুনাইবার জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিয়াছ কি? মানুষকে কাজে লাগাইয়া দিলে সে তাহার নিজের স্বভাবেই কাজ করে কিন্তু তোমরা কাহাকেও কাজে লাগাইয়াছ কি কিম্বা কাহারও হাতে কাজ ধরাইয়া দিয়াছ কি? নিজের অন্তরে বিশ্বাস থাকিলে মানুষের মনে এই বিশ্বাসটী সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তোমাদের মনে সত্যিকারের বিশ্বাস জাগিয়াছে কি এবং তোমরা অন্যের মনে বিশ্বাস-সঞ্চারণের জন্য কোনও চেষ্টা করিয়াছ কি? ঘরে ঘরে যাইবে, প্রতিটি মানুষকে

শুনাইবে যে, অনন্ত ভবিষ্যতের মানবকুলের প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্যসমূহ রহিয়াছে, তাহারই দায়ে তাহাকে কাজে নামিতে হইবে, নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লইতে হইবে। Door to Door and Man to Man,—ঘরে ঘরে আর প্রতিটি মানুষের কাছে এই কথা শুনাইতে হইবে। অতীতের যাবতীয় জীব-জগৎ এবং অতীতের সকল বিস্মৃত মানব-গোষ্ঠীর কাছে আমাদের ঋণ রহিয়াছে বলিয়াই ভবিষ্যৎ মানবের শুভ অবতরণের পথ কুসুমাস্তৃত করিবার জন্য আমাদের প্রতিজনের অপার পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং দায়িত্ব। এ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিও না, এই দায়িত্বকে বিস্মৃত হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ উতাকামুণ্ড (মাদ্রাজ)
২৩শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৭৫
(৭-৭-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

এখানে আসিয়া প্রতিনিয়তই মনে হইয়াছে যে, আমার সহস্রাধিক সুকণ্ঠ প্রিয়জনকে নিয়া যদি এখানে আসিয়া মধুর কণ্ঠে

হরিওঁ নাম-গান গাহিয়া দিগ্‌বিদিক্ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রতি পাদপে, প্রতি পুষ্পে, প্রতি পল্লবে, প্রতিটি প্রস্তরগাত্রে, প্রতিটি কুটীরের অভ্যন্তরে ভগবৎ-স্মৃতির পেলব-স্পর্শ রাখিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে উত্তরে দক্ষিণে ভেদ-দ্বেষ-হিংসা-সঙ্কুল আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের একটা স্থায়ী শুভ সূচনা হইত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনামের প্রবল বন্যা নিয়া উড়িষ্যারও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও স্থানে পূণ্য পদধূলি দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কালস্রোতে তাহার স্মৃতি অধিকাংশের মন হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। ভগবন্নামের মধ্য দিয়া যে ঐক্য, তাহারও একটা বিশেষ দিক্ তথা সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দক্ষিণের অধিকাংশ মানুষ বাংলার অনেক কথাই জানে না। বিবেকানন্দ দক্ষিণকে ধরিয়া কাজ সুরু করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের নামটী পরিচিত এবং বেলুড় মঠের প্রেরণায় দক্ষিণে ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে বলিয়া সেবার মধ্য দিয়া বিবেকানন্দ এদেশে জাগ্রত। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আসিয়া আশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া এবং জীবনের দীর্ঘতম অংশ সেখানেই নিঃশেষ করিয়া সেখানেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এখনো দক্ষিণে জীবন্ত। কিন্তু ইহা ছাড়া বাংলার অন্য কোনও খবর কেহ রাখে না। একমাত্র দিল্লী শহর ছাড়া উত্তর ভারতের অন্য কোনও স্থানের সম্পর্কে এদেশে কোনও বিশেষ কৌতূহল বা আগ্রহ কোথাও লক্ষ্য করি নাই। সুতরাং পারস্পরিক

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পরিচয় এবং সংযোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনেও দক্ষিণ দেশে তোমাদের ধর্ম্মীয় অভিযান প্রেরিত হওয়া উচিত। তামিল ভাষার অক্ষর-সঙ্কট যোগাযোগ-সৃষ্টির একটা মস্ত অন্তরায় কিন্তু এই বিঘ্নকে অধ্যবসায়ের বলে দূর করিয়া দিতে হইবে। যাহার চেষ্টা আছে, সে সফল হইবেই। নিখিল ভারতের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখিব না।

কাল ভুবনেশ্বরে শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণকে আমি এক পত্রে লিখিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে প্রচারের প্রয়োজনেই তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উড়িষ্যায় যোগ্যভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়া যাইতে হইবে। আমি আশা করি, তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবে। উড়িষ্যার স্বকীয় প্রয়োজনে যদি সেই রাজ্যে আমাদের কিছুমাত্র কাজও করণীয় না থাকিত, তথাপি দাক্ষিণাত্যের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া উড়িষ্যাতে নিদারুণ ভাবে কর্ম্মযজ্ঞ আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। ভারতের উত্তরে বা দক্ষিণে, পূর্ব্বে বা পশ্চিমে প্রায় সর্ব্বত্রই অবতার-বাদের আশ্রয় লইয়া প্রচার-কার্য্যে নামিলে তাহার সদ্যঃ সদ্যঃ সুফল দেখা যায়। কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তিকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া কয়েক বৎসর কাল সুপ্রচুর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত সংগঠন চালাইয়া যাইবার পরে পরিস্থিতি আপনা আপনি এমন দাঁড়াইয়া যায় যে, জনসাধারণ অন্ধের মত অবাধে সেই দির্দ্দিষ্ট সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অবতার-বাদ এদেশের এক মজ্জাগত

সংস্কার। তাহারই জন্য চারিদিকে কিছুদিন পরে পরেই ঘন ঘন এক একজন করিয়া বিশেষ ব্যক্তি অবতার বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন এবং আপাততঃ কিছু কিছু অনুবর্ত্তীও সংগৃহীত হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ প্রভাহীনতার দরুণ আস্তে আস্তে বিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন আর অপরেরা মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ রূপে পূজিত হইতেছেন। ইহার ফলে ঐ সকল মহাপুরুষদের গুণাবলি লোকে বারংবার স্মরণে আনিয়া একপ্রকারে লাভবান্ হইতেছেন। মহাপুরুষ-পূজার এই লাভটীকে অস্বীকার না করিলেও আমরা প্রচলিত অবতার-বাদ প্রচারের দ্বারা সংঘপুষ্টির সরল, সহজ ও অনায়াস-সাধ্য পথে পা বাড়ান হইতে প্রতিনিবৃত্ত রহিব। আমাদের অবতার প্রতি পুরুষে, প্রতি নারীতে, প্রতি জীবে জীবে; আমাদের অবতার কেহ বিষ্ণুর নহেন, কেহ শিবের নহেন, কেহ ব্রহ্মার নহেন, কেহ কৃষ্ণের নহেন,—সকলে একমাত্র পরব্রহ্মের। এই ধারার চিন্তায় এদেশবাসী স্বভাবতই অভ্যস্ত নহেন। দার্শনিক তত্ত্ববিচারের সময়ে অত্যুন্নত আলোচনা অভ্যুন্নত গবেষণার পরিচয় দিলেও আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও অধিকাংশেই মনে প্রাণে প্রচলিত প্রথারই অনুবর্ত্তনকারী। এই কারণে আমাদের প্রচার-কর্ত্তব্য অতীব দুরূহ।

* * * *

এই দুরূহ কাজ করিবার জন্য, এই নিদারুণ দায়িত্ব পালনের জন্য, এই অকল্পনীয় অভিনব কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য নূতন নূতন কর্ম্মিদল সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু ভারতেই নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র

বিপুল নিষ্ঠায় ও অপরাজেয় নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত তিনটী শতাব্দী জুড়িয়া কাজ চালাইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই দিকে তোমাদের চিন্তাকে প্রধাবিত কর।

* * * * *

ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ পুরী

৫ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৭৫

(২১-৭-৬৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উতাকামুণ্ডে অত্যধিক বৃষ্টি হইতে থাকায় শৈলশৃঙ্গ ক্লেশ বোধ করিতেছিলাম। আসিলাম বঙ্গোপসাগরের খোলা হাওয়া খাইতে আর অবিরাম সমুদ্র-গর্জ্জনে ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে। কিন্তু পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে প্রেমাঞ্জন আসিয়া খবর দিল এবং বিশদ বিবরণ জানাইল যে, নগেশ-সেতু-সংলগ্ন বিরাশি ফুট দেওয়াল হঠাৎ জলের মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। হয়ত হাজার তিনেক টাকার ক্ষতি হইল। কিন্তু যদি নগেশ-সেতুর কোনও অনিষ্ট হয়, তবে দশ হাজারের ধাক্কায় পড়িয়া যাইব। সুতরাং পুরীর সমুদ্রগর্জ্জন শুনিবার লোভে সম্বরণ করিয়া চলিতেছি পুপুন্‌কীতে মঙ্গল-সাগরের জলের উচ্ছ্বাস শুনিতে। তিনটী জলনির্গমের পথ দিয়াই

নাকি প্রবল উচ্ছ্বাসে জল চলিয়াছে কলকল রোলে। সুতরাং আবার কাজে নামিতে হইল।

মঙ্গল-সাগরের জলগমনপথকে দুই দিকে দুইটি দেওয়াল দিয়া শৃঙ্খলিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ছিল। সুদীর্ঘ দুইটী সুনির্ম্মিত দেওয়াল সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়াতে সে প্রয়োজন মিটিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোনও নৈসর্গিক কারণে এই দুইটী দেওয়ালের একটীও যাহাতে পড়িয়া না যাইতে পারে, তাহার জন্য তাহার উপর একটা ভারী ছাদের ভার পড়া প্রয়োজন ছিল। দেই দেই করিয়া এই তিন বৎসরের মধ্যে সেই হাজার তিনেক টাকার কাজটুকু করিতে পারি নাই। এবারই বর্ষাগমের পূর্ব্বে তাহা আমি করিয়া ফেলিতাম কিন্তু ভাণ্ডারে লোহা ছিল না। হঠাৎ পড়িলাম গুরুতর পীড়ায়। স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারে আসিয়া আবার আমাকে ঐ অসমাপ্ত কাজটুকুই করিবার জন্য ফিরিতে হইতেছে। কোন্ দিকে কি করিব মা, তুষের আগুন দিয়া মহোৎসবের রান্না করিতেছি।

এমন কতকগুলি কাজ থাকে, যাহা সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত করিয়া না দিলে সেই কাজ দুই বারে তিন বারে বা পাঁচবারে শেষ করিতে হয়। ইহাতে সময়, পরমায়ু এবং অর্থ সব-কিছুরই অত্যন্ত শোচনীয় অপচয় ঘটে।

এ যেন উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের মতন ব্যাপার। নেপোলিয়ান বা আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় করিলেন কিন্তু কে তাঁহাদের পরে সিংহাসনে বসিবেন, ঠিক করা গেল না। এমন রাজ্য টিকান দায়।

আমি অনেক সময়ে একথা ভাবি। যাহা আমি করিলাম ত' করিলাম, যাহা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, তাহার সূত্র ধরিবে কে? ঠিক জানিতে পারিলে মন একেবারে নিশ্চিন্ত। না জানিতে পারিলে জগতে অধিকাংশ লোকেরাই মনে কর্ম্মের প্রতি বিরাগ-ভাব আসিয়া যায়।

কাজ ধরিলেই তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে। অসমাপ্ত কাজগুলি ধরিবার লোক আশেপাশে না থাকিলে আয়ুর উপরে উৎপীড়ন করিতে হয়। কারণ, কর্ম্মীর নিকটে জীবনটা তুচ্ছ, কাজটাই মুখ্য।

ভুবন ভরিয়া আমার সন্তান-দল আমার নামের জয়ধ্বনি দিতেছে কিন্তু তাহারা কয়জনে এই কথাটা ভাবে? আমি যে পুপুন্‌কীতে দেওয়াল গাঁথিতেছি, ইহা ত' আমার প্রতীক-কর্ম্ম, আসল কর্ম্মটা উহারই অনুরূপ, কিন্তু সে কাজ কাহারও চখের সীমানায় এখনো পৌছে নাই বা কেহ চখ খুলিয়া দেখিতেছে না। আমি যতই বলিব "তোমরা আমার বাহু হও", ততই কি ইহারা দূরে সরিয়া বসিবে এবং ইহাদের বাহুবলের সহায়তা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে? তাহাই যদি করে, তবে ত' আরও দশটা দেওয়াল বিশটা ইমারত এভাবেই ধ্বসিয়া পড়িবে, আমার আর স্বাস্থ-নিবাসে শরীরকে তোয়াজ করা হইবে না।

কে আছে জগতে এমন হতভাগ্য মানুষ, যে যোগ্য উত্তরাধিকারী অর্থাৎ উত্তর-সাধকের প্রত্যাশা করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

মঙ্গল-কুটীর, পুপুন্‌কী
১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৭৫
২-৮-৬৮ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও।

রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। তোমরা আমার বিশ্বস্ত সৈনিক। তোমরা এখন বসিয়া থাকিতে পার না। প্রত্যেকে যুদ্ধোন্মাদনা লইয়া কাজে লাগে। সেকাজ অজ্ঞানতার বিদূরণ, সেকাজ প্রত্যেকটী মানুষের মনে ও প্রাণে সত্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন। তোমরা কোনও অবতারকে প্রচার করিতেছ না, প্রচার করিতেছ স্বয়ং পরব্রহ্মকে। এইখানেই তোমাদের বাজিমাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন তোমাদের প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম। কিন্তু শ্রম কি একা একাই করিবে, না, দশজনকে সঙ্গে লইয়া করিবে? দশজনের কথা উঠিলেই ত' আবার শৃঙ্খলার কথাটা আসে। হাজার লোকের বিশৃঙ্খল চেষ্টার চেয়ে তিনটী লোকের সুশৃঙ্খল সহযোগ অধিকতর স্থায়ী কল্যাণ সাধিতে পারে। তোমরা শৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য দিতেছ কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

মঙ্গল-কুটীর, পুপুন্কী
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৫
২-৮-৬৮ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ অ—র পত্র বড় বিলম্বে পাইলাম। আশীর্ব্বাদ করি সে যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করুক। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠার প্রতি দৃকপাত না করিয়া তোমাদিগকে কাজ করিতে হইবে এবং সফলতা লাভ করিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠা লব্ধ হইল, তাহাকে হীন তামসিক বা উদ্ধত রাজসিক পন্থায় নিয়োগ না করিয়া সাত্ত্বিক পন্থায় নিয়োগ করিবে।

তুমি ত' বাবা স্থানীয় অখণ্ডসেবাদলের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছ। দেখিও, পদগর্ব্বে কোনও ভুল না করিয়া ফেল।

তোমার পদযাত্রার পরিকল্পনা বোধহয় ফলপ্রসূ হইবে। কিন্তু কোনও কাজই স্থানীয় প্রধানদের পরামর্শ ছাড়া করিও না। নেতা হও কিন্তু কর্ত্তা হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫ *

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একের মধ্যে সব-কিছুকে দেখার চেষ্টারই নাম সাধনা। আমি তোমার ভিতরে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পাইতেছি। একজনের ভিতরের প্রস্ফুটন যখন বিশ্বব্যাপী কুশলের সূত্রপাত করে, তখন সেই একটী মাত্র ক্ষুদ্র মানুষ একটী বিশ্বমানবে পরিণত হয়।

তুমি কথাগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিও।

প্রাণবান মানুষ প্রথমে নিজেকে দেশের সমস্ত মানুষের সহিত অভিন্ন বোধ করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহার ভিতরে

---

* ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ বাংলার চিঠিগুলি প্রেসে হারাইয়া যাওয়াতে পূর্ব্বে ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ হইতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ এর চিঠিগুলি প্রতিধ্বনি কার্ত্তিক হইতে চৈত্র (১৩৭৫) সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। হারাণো পত্রগুলি প্রেসে পুনরায় পাওয়া যাওয়ায় আমরা ১৩৭৬ এর বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রতিধ্বনিতে প্রকরাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে পত্রগুলির তারিখের পারম্পর্য্য রাখা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। প্রতিধ্বনিতে যেভাবে ছাপা শয়িয়াছে, পুস্তকেও তদ্রূপই ছাপাইয়া দিলাম।—প্রকাশক

ত্যাগ, সংযম, আত্মদানের সামর্থ্য জাগিয়া ওঠে। দেশাত্মবোধ তখন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ব্যক্তিগত তুচ্ছ সার্থকতাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয় এক অনির্ব্বচনীয় অনবদ্য দেবভাবে। কিন্তু অন্তরের ভাবে যখন দেবত্বের প্রভাব পড়ে, তখন ভৌগোলিক একটী সীমার মধ্যে মানুষ আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তখন সে হয় বিশ্বময়। তখন তাহার চিন্তা, কর্ম্ম, বাক্য, আচার, বিচার, অনুশীলন সবই বিশ্বের কুশলকে লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হয়। প্রথমে ইহা হয় চেষ্টাকৃত, প্রয়াসসিদ্ধ, পরে ইহা হইয়া পড়ে অনায়াসসিদ্ধ, সভাবসঞ্জাত।

তোমাকে এই বিশ্বময়ী, বিশ্বম্ভরী, বিশ্বাত্মার প্রতীক রূপে আমি দেখিতে চাহি।

দেশটার দিকে একবার তাকাও। খবরের কাগজে পড়িলাম, আগ্রাতে তিনটী কিশোরের উপরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। তাহাদের বয়স যথাক্রমে পনের, ষোল আর সতেরো। ব্যাপার কি? ইহারা পনের বৎসরের একটী বালক-বন্ধুকে বলিয়াছিল,—"চল্ ভাই এক হাজার টাকা নিয়া, আমরা বোম্বাইতে গিয়া ছায়াচিত্রের তারকা হইব। তুই ত' মস্তবড় ধনী বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র।" পনের বছর বয়সের ধনীর পুত্র টাকা নিয়া আসিল তাজমহলের কাছে। তখন সঙ্গীরা বলিল,—"আমাদের ত' অভিনেতা হইতে হইবে। আয় ভাই, আমরা একটা হত্যাদৃশ্যের অভিনয় করি।" অভিনয়ের মহড়া চলিল, হঠাৎ তিন বন্ধু সত্য

সত্যই হত্যারু হইল। টাকা যে নিয়া আসিয়াছিল, ছুরিকাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল।

এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা কখনো কল্পনা করিতে পার? ভাবিয়া দেখ, দেশটা কত অধঃপাতে নামিয়াছে। দেশের অধঃপতন নিবারণের জন্য, দেশকে পুনরায় আদর্শ স্থানে টানিয়া তুলিবার জন্য আজ দেশাত্মবোধ-প্রবুদ্ধ কত ত্যাগী চাই। কত তাহাদের করিবার রহিয়াছে। কত-কিছু এতকাল আমরা করি-করি করিয়াও করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সময়ে ব্যক্তি-স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া সে কিরূপে কাল কাটাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বকে যাহার আপন করিতে হইবে?

সৎ কার্য্যের নাম করিয়াও কত ছল-প্রবঞ্চনা চলিতেছে। মঠ, আশ্রম, মন্দির আদি খুলিয়া কত কত বকধার্ম্মিক শুধু গৃহে গৃহে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে। চাউলে, আটায়, সর্ষপতৈলে, পেটরোলে আর ঘৃতেই শুধু ভেজাল নয়, এখন ধর্ম্মেও ভেজাল চলিতেছে। কত কত প্রতিভাবান্ পুরুষকে এক একটা ধর্ম্মসংস্থা গিলিয়া খাইতেছে আর তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অকারণ দুঃখ, নিরর্থক অশান্তি, অহেতুক কলহ সৃষ্টি করিয়া এক একটা সোনার সংসারে আগুন লাগাইয়া দিতেছে।

এ সকল কথা ভাবিয়া দেখ মা। ভাবিয়া দেখ, এই দুঃখদগ্ধ সংসারে মানুষকে ধর্ম্মের নামে প্রতারণা হইতে বাঁচাইবার জন্যও তোমাদের কতকিছু করণীয় রহিয়াছে।

আমি আশাবাদী, হতাশ কখনো হই না। দুর্য্যোগের দুরন্ত অন্ধকারেও অজানা পথে নির্ভয়ে চলিতে আমার দ্বিধা নাই। আমি তোমাকে চাহি। আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে তুমি থাকিবে। ব্যক্তির ক্ষুদ্র-স্বার্থ-পরায়ণ সঙ্কীর্ণ মনটীকে দেশাত্মবোধ দিয়া উদার করিয়া দেশপ্রেমিকের সরস মনকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিয়া আমি আমার বিশ্বৈকাত্মবাদকে সার্থক রূপায়ণ দিতে চাহি। প্রস্তুত হও মা, প্রস্তুত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

মঙ্গলবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

(২১-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও। আমি যখন একটী ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করি, তখন ঐ একটী ব্যক্তির ভিতরে বিশ্বের প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে উপস্থিত জানিয়া সমস্ত মনঃপ্রাণ উজাড় করিয়া দিয়া স্নেহ ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও আশিস ঢালিতে থাকি। বৈদিক ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বিশ্বদেববাদ, আমি আস্বাদন করিয়াছি বিশ্বমানববাদ। একটী

মানুষও বিশ্বের অপর নকল মাদব হইতে দূরে নহে, স্বতন্ত্র নহে, বিচ্ছিন্ন নহে,—একটীর মধ্যেই সবাই আছে আর সকলের ভিতরে ঐ একজন আছে। ব্যক্তিমানবে আর বিশ্বমানবে এই ওতপ্রোত সম্বন্ধ আমার নিকটে এত সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তোমরা যখন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে চঞ্চল, অধীর, উদ্বিগ্ন বা অতিমাত্র উত্তেজিত হও, তখন মনে মনে অফশোষ করি, আমার সন্তান হইয়াও ইহারা কেমন অবোধ শিশু।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া তোমরা প্রতিজনে উদ্দাম নিশ্চিন্ততার আশ্রয় হও। নিশ্চিন্ততার মানে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা নহে। তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে করিতেই হইবে, শুধু উদ্বেগবর্জ্জন করিয়া করিবে। সর্ব্বকর্ম্ম এবং সর্ব্বকর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ কর। তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে না পাও, প্রাণে গভীর ভালবাসা থাকিলে আমাকে তাঁহার পার্থিব প্রতীক জানিয়া, আমাতে তাহা অর্পণ কর। অতটা গভীর ভাবে আমাতে তোমার প্রীতি না থাকিলে আমি যে পরমেশ্বরের জাজ্বল্যমান সাক্ষী স্বরূপে তোমার সম্মুখে বিদ্যমান, একথা ভাবিয়া নিতে ক্লেশ হইবার কারণ দেখি না। কারণ, তোমার সহিত আমার কোনও জাগতিক স্বার্থের সম্বন্ধ নাই। আমি চাহি তোমার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্নতা, যাহার ফলে তুমি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হইবে না, সংসারে থাকিয়াও সন্নাসীর ন্যায় নির্দ্বন্দ্ব তুরীয় অবস্থায় বিরাজ করিবে, সহস্র সহস্র লোকের পরম হিত সাধন করিয়াও গর্ব্বিত হইবে না, বিরাট

বিরাট আশাপ্রদ পরিকল্পনায় হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেলেও কণামাত্র হতাশায়, অবসাদে, আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনায় ক্লিষ্ট হইবে না, সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিপত্তির মধ্যেই শির রহিবে উচ্চ, মন রহিবে নির্ব্বিকার, উদ্যম রহিবে অবিচল, লক্ষ্য রহিবে অচ্যুত। তুমি তোমার অন্তরের সমস্ত বেদনা আমাতে ঢালিয়া দিয়াও ত' ভারমুক্ত হইতে পার, এই সদুপায়টী তোমার হাতে রহিয়াছে। আমি তোমার পূজা চাহি না, তোমার সেবা চাহি না, তোমার অকুণ্ঠ আনুগত্য চাহি না, আমাতে তোমার অব্যভিচারিণী ভক্তি চাহি না, দেহের এবং মনের দিক দিয়া আমি তোমার কাছ হইতে কোনও কিছুই চাহি না, কিন্তু যদি সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পার, আমাকে তোমার সমস্ত উদ্বেগ ও আতঙ্কগুলি দান করিয়া ফেল,—আমি তোমাকে ভারমুক্ত দেখিতে চাহি।

তুমি যখন হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল মনে দুর্য্যোগের রাতেও নির্ভয়ে সংসারের সহস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল সুদুর্গম রণাঙ্গণ পরিক্রমণ করিবে, তখন তোমার শৌর্য্য ও স্থৈর্য্য, তোমার বীর্য্য ও ধৈর্য্য, তোমার অকপট সংগ্রামশীলতা ও অন্তরভরা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আমার প্রাণে উৎসবের কলরব জাগাইবে। তোমার মত একজনের অভ্যুদয়ের মধ্যেই আমি বিশ্বজনের অভ্যুদয়ের পরম সূত্রটীকে পাইব। আমি বিশ্ববাসী সকলের জন্য কাঙ্গাল, আমি তোমাকে বিশ্বের সকলের মধ্য দিয়া আর বিশ্বকে তোমার মত প্রতিজনের মধ্য দিয়া দেখিতে চাহি।

সাধুসঙ্গ যদি তোমাকে নির্ম্মল, নির্ম্মুক্ত, নিরুদ্বেগ না করিল, তবে বলিব, তোমার সাধুসঙ্গ মিথ্যা হইতে চলিয়াছে; এ কাহাদের সঙ্গ তুমি করিতেছ? যাহাদের সঙ্গ করিলে সংসারের তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারকে বড়ই বিরাট বলিয়া মনে হইবে, তাহারা সাধু? যাহাদের সংসর্গে আসিলে, ধরিত্রীর মত ক্ষমা অন্তরে করিবে না বিরাজ, শুধু মান, শুধু অভিমান, শুধু অভিযোগ, শুধু অসন্তোষ পুঞ্জায়মান হইয়া তুষানলের মতন বক্ষপঞ্জরকে দিবারাত্রি করিবে দহন, তাহারা সাধু? যাহার সঙ্গ করিলে অন্তরের মহত্ত্ব দিনের পর দিন বাড়ে না, আমি তাহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এমন সাধু খুঁজিয়া বাহির কর, যাহার সঙ্গ তোমার জরাজীর্ণ হৃদয়ের শত দাবানলের সঞ্চিত ভস্মরাশির নীচ হইতে নবচেতনার বীজকে নবারুণ-সম্পাতে সুন্দর অঙ্কুরে ও কিশলয়ে রূপান্তরিত করিবে, যাহার ফুল মধুময়, যাহার ফল মধুময়, যাহা নির্বীজ হইলে অমৃত, যাহাতে বীজ জন্মিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মরুভূমিকে করিবে চির-শয্যামায়মান দেবভূমি। এই ভারতবর্ষে একদিন প্রকৃত সাধুরা বাস করিয়া গিয়াছেন, পুনরায় তাঁহাদের আবির্ভাব কেন ঘটিবে না?

ভারমুক্ত, শান্ত ও নির্ব্বিকার হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা কর। শাস্ত্রানুশীলনের নাম করিয়া অন্তরের গ্লানি এবং আচরণের কুসংস্কার সমূহকে বিবর্দ্ধিত আর প্রবর্দ্ধিত করিও না। শাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক, জগতের কোনও শাস্ত্রই মানুষকে

শাসনের বেত্রদণ্ডে পরিচালিত করিবার জন্য নহে, শাস্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করায়। শাস্ত্র শব্দটীর আওয়াজ অনেকটা শস্ত্রের মতই ইস্পাত-ঝনৎকার-যুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, শাস্ত্রের আবির্ভাব মানুষকে প্রেমিক করারই জন্য। প্রেম যদি জগতে না থাকিত, সব শাস্ত্র মিথ্যা হইয়া যাইত। পরমদেবতা পরমেশ্বর যদি না থাকিতেন, সব প্রেম অলীক স্বপ্ন মাত্র হইত। তাই, তার্কিকেরা যাঁহাকে প্রমাণিত করিতে পারিলেন না, বৈজ্ঞানিকেরা যাঁহাকে এত খুঁজিয়াও পাইলেন না, তিনি নিজের শক্তিতে, নিজের মহিমায় কোটি কোটি মানুষের প্রাণের ভিতরে আভাস রূপে ধরা দিয়া বসিয়া আছেন। গীর্জ্জাই ভাঙ্গ, আর মন্দিরই তোড়, মসজিদই উৎখাত কর আর প্যাগোডাই জ্বালাও, ঈশ্বর তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জ হইতে সরিয়া যাইবেন না। কেহ কেহ তাঁহার মঙ্গল-মুরলী শুনিয়াছে এবং তাঁহাকে না দেখিয়াও তাঁহার চরণে ডেহ-মনঃ-প্রাণ, জীবন-যৌবন, ইহপরকাল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব-কিছু সঁপিয়া দিয়াছে। এই সমর্পণের একান্ত এবং প্রত্যক্ষ সুফল নিশ্চিন্ত হওয়া, নিরুদ্বেগ হওয়া।

তোমাকে যাহা লিখিলাম, তাহা আমি সকলের জন্য লিখিলাম। আমি একাকী কাহারও জন্য কিছু করি না, যখন যাহার জন্য যে কাজটী করি, তখন পটভূমিকায় অনন্ত অনাগত যুগের কোটি কোটি নর-নারীও দাঁড়াইয়া থাকে। আর, আমি আমাতে

অনন্ত অতীত, অপার বর্ত্তমান ও অশেষ ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
শুক্রবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(২৪-৫-৬৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হতাশ, অবসন্ন, দুর্ব্বল হৃদয়ে আশা, উৎসাহ ও সবলতা জাগাইতে ভগবানের মঙ্গলময় নামের নিয়ত স্মরণের চেয়ে সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ জগতে আর কিছু নাই। এই ঔষধ সেবন করিবার যাহাদের অভ্যাস আছে, একমাত্রই তাহাদের উপরে অমোঘ ক্রিয়া হয়। যাহাদের অভ্যাস পাকা নহে, যাহাদের অভ্যাস সাময়িক বা নিতান্তই সাম্প্রতিক, তাহাদের দুই, দশ, বিশ বা শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি মাত্রার প্রয়োজন। ঔষধ গুণ দিবেই, অল্প মাত্রাই হউক, আর অধিক মাত্রায়ই হউক। একবার ভগবানের নাম করিয়া যদি দশদিন চুপ করিয়া থাক, মনে করিও না যে ঐ

একবার স্মরণের ফলটা ইহাতে উবিয়া গিয়াছে। দিনান্তে, সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে, মাসান্তে, বর্ষান্তে বা যুগান্তে যদি মাত্র একবার করিয়া ভগবানের পরমমঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে থাক এবং মধ্যকালটুকুতে যদি একেবারে ভুলিয়াও যাও, তথাপি পরবর্ত্তী বারে নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী বারের স্মরণের সুফল তোমার আসিতে থাকিবে। এ যেন পোষ্ট-অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতা। একবৎসর আগে চারি আনা জমা দিবার পরে একবৎসরান্তে পুনরায় চারি আনা জমা দিবার কালে দেখা যাইবে যে, আগের পয়সা কয়টা ঠিকই আছে, বরং যদি কিছু বেশী পয়সা জমিয়া গিয়া থাকে, তবে তার সুদও কিছু না কিছু লভ্য হইয়াছে। বারংবার বলিতেছি, জমাইবার অভ্যাস কর। ভগবানের নামের ব্যাঙ্কেই জমাও আর সংসারী তহবিল হইতে পয়সা বাঁচাইয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতেই জমাও, পারমার্থিক ধনই জমাও আর ঐহিক ধনই জমাও, ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে, এই ভরসা লইয়া প্রতিজনে জমাইবার অভ্যাসটী প্রাণপণে করিতে থাক। কথায় বলে "সঞ্চয়ী নাবসীদতি"—সঞ্চয় করিলে কখনো বিপদে পড়িতে হয় না।

বাক্‌সংযমও একপ্রকারের ব্যাঙ্কেই টাকা জমানো বলিয়া জানিও। ইন্দ্রিয়-সংযমও আর এক প্রকারের ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স বাড়ানো বলিয়া জানিও। যে যেদিক দিয়া যতটুকু জমাইতেছ, সে ততটুকু বলসঞ্চয় করিতেছ। এই বল তোমার জীবনে শত সহস্র বার নানা বিচিত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে।

আত্মাভিমান না কমাইলে সংঘাভিমুখিনী চেতনা জাগে না, মন চাহে কেবল নেতৃত্ব করিতে, কর্ত্তৃত্ব করিতে। কিন্তু যে সেবক নহে, সে নেতা হইতে পারে না। সেবক হইতে হইলেই তোমাকে আগে ঈশ্বরানুগত হইতে হইবে। ভগবানকে অনুক্ষণ যে স্মরণ করে, ভগবান নিজ হাতে তাহার চরিত্র-সংশোধন করিয়া দেন। এই জন্যই বলি, তোমরা প্রত্যেকে সাধন কর। সাধন কখনো নিষ্ফল হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা নিজেদের অমিত শক্তিতে বিশ্বাস করিও এবং এই বিশ্বাস অপর সকলের মনে সঞ্চারিত করিও। ছোটবড় সকলের মনে বিশ্বাস জাগাইতে পারার নামই নেতৃত্ব। মণ্ডলীর সম্পাদক বা সভাপতি হইতে পারিলেই কেহ নেতা হয় না। প্রতিজনের অন্তরে জ্বলন্ত বিশ্বাসকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া প্রত্যেকের দেহ-মনঃ-প্রাণকে পরিকল্পিত কর্ম্মে দ্রুত সংযোজিত করিয়া দিয়া

সেই কাজকে অবিরাম সমান বিক্রমে চালু রাখার ভিতরেই সফল নেতৃত্বের প্রমাণ মিলিবে। নিজের ব্যক্তিত্বাভিমানকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া তোমরা সফল নেতায় পরিণত হও। এখন যাহা করিতেছ, তাহা ত' নেতাগিরির ন্যাকামি।

প্রত্যেকের শক্তিকে উদ্যত কর। একজনকেও বসিয়া থাকিতে দিও না। প্রত্যেকে বিশ্বাস করুক যে, প্রত্যেকে তাহারা মহাকার্য্য সাধনে সমর্থ। সরল সেবাবুদ্ধি ও ভক্তিবিশ্বাস লইয়া প্রত্যেকে কাজ কর, প্রত্যেকেই তোমরা অলোকসামান্য ব্যাপার ঘটাইতে পারিবে। সরল মনে এবং কর্ত্তৃত্বলিপ্সাহীন হইয়া যাহারা আমার অভিপ্রায় পূরণের জন্য শ্রম দিবে, আমি তাহাদিগকে মহাশক্তি দিব। যাহারা আমাকে বিশ্বাস কর, এ প্রতিশ্রুতি তাহাদের জন্য জানিও।

তোমাদের বচনবাগীশতা যে তোমাদের প্রতিটি কর্ম্মের শত্রুতা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? কথা কমাও। নতুবা কাজ বাড়িবে না। যত বেশী কথা বলিবে, কাজের পরিমাণ, গুরুত্ব, উৎকর্ষ ও উপযোগিতা ততই হ্রাস পাইবে।

বক্তৃতা দান একটা বিলাস। এই বিলাসে তোমরা কেন প্রমত্ত হইতেছ? এক রতি কথা আর হিমাচলমিত কাজ তোমাদের লক্ষ্য হউক।

কর্ম্মক্ষেত্র হাতের কাছে, তবু তোমরা হাত না চালাইয়া কেবল রসনার চটুলতা অভ্যাস করিতেছ কেন? রসনাকে সংযত কর।

কথা কহিলেই পরনিন্দা আসে। পরনিন্দা আসিলেই নিজের শক্তি অতি দ্রুত ক্ষয়িত হইতে থাকে। জগন্নাথের রথ চালু হইয়া গিয়াছে। যাহারা তামাসা দেখিবার, তাহারা দেখুক। কিন্তু রথ চলিবেই। তোমরাও কি তামাসা দেখিবে? আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, কেহ তোমরা পাঁচ বৎসর, কেহ দশ বৎসর, কেহ বিশ বৎসর ধরিয়া কেবল কথাই শুনিতেছ। কাজে কি কখনই হাত দিবে না?

কিন্তু ভগবানের কাজ ভগবান করাইয়া নিবেন। তোমরা যদি শুদ্ধ আধার হইতে না চাহ, তবে অন্যকে দিয়া করাইবেন। অলস আর অহঙ্কৃত এই দুইটীর প্রতিই বিধাতার ধিক্কার চিরসত্য বলিয়া জানিও। নিরলস হও, নিরহঙ্কার হও, তবেই তোমরা মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবার পথ পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
শনিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(২৫-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

৭১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তোমাকে লিখিয়াছিলাম,—"নিজের অন্তরের প্রেমকে খাঁটি করিবার জন্য ত্যাগের অনুশীলন প্রয়োজন। ত্যাগ ব্যতীত প্রেমের পরীক্ষা হয় না, আবার, সাধন ব্যতীত প্রেম জন্মে না। একই বস্তুকে বারংবার শ্রদ্ধা সহকারে ধ্যান করিবার নাম সাধন।"

তুমি যে যত্ন করিয়া পত্রখানা এতদিন রাখিয়াছ, তাহাতে আনন্দ অনুভব করিতেছি। কত চিঠি ত' লিখি, পত্র পাইতে পাইতে ছেলেমেয়েদের তাহাতে অনাদর ধরিয়া গিয়াছে। কেহ না পড়িয়াই বেড়ায় গুঁজিয়া রাখে। যাহারা ভক্তিমান্, তাহারা পত্রখানাকে তিন মিনিট ধরিয়া প্রণাম করিয়া তারপরে তাহাতে ফুল-চন্দন লাগাইয়া পূজা করে বা পরম মূল্যবান্ সম্পদ জ্ঞান করিয়া সিন্দুকে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। কেহ কেহ পড়ে কিন্তু অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করে না। হাজার জনে পত্র পাইলে মাত্র একজনে দুই জনে পড়ে, লক্ষ জনে পত্র পাইলে একজনে দুই জনে পড়িয়া অর্থ গ্রহণ করে এবং অপরকে তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু হায়, প্রত্যেকখানা পত্র আমি বুকের রক্ত দিয়া লিখি, প্রতিখানা পত্রের সঙ্গে আমি আমার মূল্যবান্ পরমায়ু কিছুটা মাখিয়া দেই।

চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহারই পৃষ্ঠান্তে আজ ১১/২/৭৫ তারিখে লিখিতেছি যে, যুগের পর যুগ ভোগে প্রমত্ত থাকিবার পরেও তোমাদিগকে ত্যাগের পথেই

আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কেননা ত্যাগেই অমৃত, ভোগে নহে। এই কথাটী চিরকালই ভারতের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা বলিয়া আসিয়াছেন, কেহ শুনিয়াছে, কেহ শোনে নাই। আজ এই কথাটী শুধু কথার কথা থাকিবে না, আজ এই কথাটী জীবনের কর্ম্মে রূপ পাইবে। কারণ, আজ জীবনের সর্ব্বস্তরে ঋষিত্বের সাধনা আত্মপ্রকাশ করিবে।

তোমরা স্বামী ও স্ত্রীতে পূর্ণ সংযম-ব্রত পালন করিতে চাহিতেছ। উত্তম, পালন কর। এই কথাটী ডাকিয়া তোমাদের এতদিন বলি নাই কেন জান? প্রতীক্ষায় ছিলাম যে, তোমরা নিজেরা এই ব্রতটী ধারণের জন্য অন্তরে আবেগ অনুভব কর কি না। আজ যখন আবেগ আসিয়া গিয়াছে, এই শুভ মুহূর্ত্তের শুভ সঙ্কল্পকে তুচ্ছ করিয়া গ্রহণ করিও না, হেলায় ফেলায় ব্রতচারী হইও না, সত্যিকারের সঙ্কল্প করিয়া ব্রতারূঢ় হও। অদৃশ্য সহায় পরমেশ্বর প্রতি পদে তোমাদের সাহায্য করিবেন।

দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ কালে একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। তাহা এই যে, বাহিরের কোনও লোক এই সংবাদটী জানিবে না। জানিলে, তোমাদের মনে অহঙ্কার আসিবে। অহঙ্কার আসিলে পতনও অনিবার্য্য হইবে। যে যত নিরহঙ্কার, সে তত শক্তিমান্। প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ দেশ-কর্ণধার যেমন দেশের শত্রুকে জানিতে দেন না যে দেশে কত সৈন্য আছে, কি কি অস্ত্র সম্ভার আছে, এ দেশের রণ-বৌশল

কি, তদ্রূপ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য পালনেচ্ছু দম্পতী বাহিরে কাহাকেও ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেন না যে, তাঁহারা দুই জনে ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির মধ্যে একত্র বাস করিয়াও পালন করিয়া যাইতেছেন পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য। এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
মঙ্গলবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(২৮-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা,— প্রত্যেকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার পুত্র বা আমার কন্যা হওয়ার আসল অর্থটা তোমরা কেহই ভুলিও না। আমার পুত্র বা আমার কন্যা হওয়ার অর্থই হইতেছে, জগন্মঙ্গল-কর্ম্মের একজন কর্ম্মী হওয়া। তাহার জীবন কর্ম্মযোগের জীবন, যে জীবনে কর্ম্মকে তপঃসাধনায় রূপায়িত করিয়া নিতে হইবে, যে জীবনে তপস্যাকে প্রতিটি কর্ম্মের একান্ত সঙ্গিনী করিতে হইবে। এই কর্ম্ম তোমাদের প্রতিদিনকার নিয়মিত

উপাসনার অঙ্গরূপে জগন্মঙ্গলসঙ্কল্পের মধ্য দিয়া সুরু হইবে এবং ঐ উপাসনা-কালীন কিয়ৎক্ষণিক সঙ্কল্প আস্তে আস্তে তোমার মনেরও অগোচরে সারাদিন-সারারাত্রি-ব্যাপী জগৎকল্যাণানুধ্যানে পরিণত হইবে। এই চিন্তা একাগ্র, প্রগাঢ়, ক্ষীরবৎ অটল হইলে বিনা চেষ্টায় তোমাকে দিয়া জগতের কল্যাণ-কর্ম্ম করাইয়া লইবে।

আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। আমি কোনও মামুলী গুরুগিরি করিবার জন্য তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করি নাই। তোমরা তোমাদের দিজ নিজ জীবনের পুণ্যকর্ম্মের অমোঘ ফলে নিজেদের শক্তিতে পরিত্রাণ পাইবে এবং জগৎকে পরিত্রাণ বিলাইবে,—তোমাদের জন্য আমাকে বিশ্বপতির অবতার সাজিতে হইবে না।

আমার নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণের যখন তাৎপর্য্যই এইরূপ, তখন আমি কেন প্রত্যাশা করিব না যে, দীক্ষা নিবার পরে তোমরা সাধন-ভজনে যেমন মনোনিবেশ করিবে, তেমন আবার জগজ্জনের কল্যাণের জন্য কাজও করিবে। যে কাজ যত নির্ব্বিরোধ, সে কাজ তোমার পক্ষে তত নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়। কাজ করিতে হইবে বলিয়াই মানুষের সঙ্গে কলহ সৃষ্টি তোমরা করিতে পার না, কারণ যে যেই সম্প্রদায়েরই হউক, ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ তোমার আপন জন, তোমার আপন ভাই, তোমার আপন বোন্।

কোনও কোনও স্থানে আমার পুত্রকন্যারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া

একা একা কাজ করিতেছে। কোথাও কোথাও অনেকে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতেছে। বলিতে যদি পারিতাম যে, এমন ভাবে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, যাহাতে একটী সমসাধক বা সমসাধিকাও নিজের শক্তি দিয়া সহযোগ করিতে বিরত হইতেছে না, তবে বড়ই পুলকিত হইতাম। যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ হইতেছে, সেখানে সঙ্ঘের সহিত কায়মনোবাক্যে জড়িত অল্প কয়েকজন লোকমাত্র। এই অল্প কয়েক জনকে সংখ্যাবলে বলীয়ান্ হইয়া সঙ্ঘকে আরও ব্যাপক, বিস্তৃত ও শক্তিশালী করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে হইবে। তোমরা সেই দিকে দৃষ্টি দাও।

যেখানেই সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ চলিতেছে, সেখানে অল্প শ্রমে অধিক ফল প্রত্যাশার সুযোগ আসিতেছে। ব্যক্তিত্বাভিমান বর্জ্জন করিলেই সংঘবোধ দানা বাঁধে। প্রকৃত সঙ্ঘবোধ আসিলে দুর্ব্বলেরা অপর দশজনের সহায়তায় সবলের যোগ্য কাজ করিয়া চমৎকৃত হয়। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মদনপুরে যেন কাজ হইল, রমণপুরে যেন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ হইল, কাজের ইহাই শেষ নমুনা নহে। মদনপুর, রমণপুর, অমলপুর প্রভৃতি দশ বিশটী স্থানের সংঘবদ্ধ কর্ম্মীরা এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা আবার অন্যত্র ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ সেবা দিয়া আসিল। ইহাও কাজের একটা চমৎকার ঢং। কলিকাতা মণ্ডলী ইহা করিতেছেন। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ সর্ব্বত্র হওয়া দরকার। সংঘবদ্ধ সংগঠনের অর্থই হইতেছে যূথবদ্ধ প্রয়াস। এই জিনিষটী তোমাদের মধ্যে রপ্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত তোমরা কর্ম্মকুশলী হইতে পারিবে না। এই জন্যই এই বিষয়ে আমি তোমাদিগকে বারংবার লিখিতেছি।

একই গ্রামে বা সহরে পাঁচটী করিয়া মণ্ডলী থাকিবার প্রায়োজন পড়ে না। এই স্থলে মণ্ডলী বলিতে মণ্ডলীর Governing Body বা কার্য্য-পরিচালক-সমিতি বুঝাইতেছে। মণ্ডলী একটা থাকিয়াও পাঁচটা কি দশটা উপাসনা-কেন্দ্র থাকিতে পারে। সমবেত উপাসনাই যখন আসল কথা, তখন উপাসনা-কেন্দ্রগুলি সজীব থাকিলে নামান্তরে তাহাই মণ্ডলী হইল বলিতে হইবে। এই হিসাবে ধরিলে এক গ্রামে বা একই সহরে পাঁচটী বা দশটী মণ্ডলী থাকিবার কোনও বাধা হয় না। প্রত্যেক উপাসনা-কেন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাধিকারী থাকা দরকার নতুবা দায়িত্বপালন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল হইবে না। সুতরাং উপাসনা-কেন্দ্রও প্রকৃত প্রস্তাবে একটী মণ্ডলীই হইল। তবু যদি কেহ দাবী করে যে, একটী সহরে আলাদা দুইটী, চারিটী বা দশটী মণ্ডলী হওয়া চাই, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত সার্থকতা আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে এক সহরে বা গ্রামে একাধিক মণ্ডলী থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার ফলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের শক্তি কমিয়া যায়। আর, সাধারণতঃ এই জাতীয় দাবীর উৎপত্তিস্থল হইতেছে ব্যক্তিগত দ্বেষ বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালোভ। সমবেত উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করিয়া সকলের মধ্যে সমত্ব আনয়ন। সুতরাং একই সহরে বা গ্রামে একাধিক মণ্ডলী না করিয়া একই মণ্ডলীর সহিত প্রীতিপূর্ণ

সম্পর্কযুক্ত বহু উপাসনাকেন্দ্র হওয়াই প্রয়োজনস্থলে বাঞ্ছনীয়। আলিপুরদুয়ার সহরে একটী মণ্ডলী আছে কিন্তু পাঁচটী না ছয়টী আঞ্চলিক মণ্ডলী আছে। এই আঞ্চলিক মণ্ডলীগুলি সহর-মণ্ডলীর সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং সহরের নানা প্রান্তের উপাসক ও উপাসিকাগণ যাহাতে নিজ নিজ গৃহ-সমীপস্থ উপাসনা-কেন্দ্রে যোগদানের প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইতে পারেন, মাত্র তাহারই জন্য এই কয়টী আঞ্চলিক মণ্ডলী আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কয়টী আঞ্চলিক মণ্ডলী কয়েকটী অতি উত্তম উপাসনা-কেন্দ্র মাত্র। অন্যান্য সকল সংঘসাধ্য ব্যাপারে ইহারা সহর-মণ্ডলীর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে মিলিত। যেখানে দেখা যাইবে যে, নূতন আর একটী মণ্ডলী সৃষ্টির দাবী করিবার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে কাহারও ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠা বা কতিপয় ব্যক্তির মনোগত আক্রোশ, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, আলাদা মণ্ডলী হইবার পরেও মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে আড়াআড়ি, দ্বেষাদ্বেষি, চুলাচুলিই চলিবে। কিন্তু ইহা গুরুদ্রোহ। আমি তোমাদের গুরু কিন্তু আমি তোমাদিগকে মণ্ডলীতে আমার মূর্ত্তি পূজা করিতে নির্দ্দেশ দেই নাই। নির্দ্দেশ দিয়াছি,—

"মণ্ডলীং স্থাপয়িত্বা চ
মন্যেত গুরু-বিগ্রহম্"

—মণ্ডলী স্থাপন করিয়া উহাকেই গুরুদেবের বিগ্রহ বলিয়া

জ্ঞান করিবে। এ অবস্থায় মণ্ডলী লইয়া মলহ" গুরুদ্রোহ ছাড়া আর কি হইবে?

জামশেদপুর সহরে মণ্ডলী একটী। সেই মণ্ডলীতে সহরের সকল প্রান্তের প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব করিতেছেন। কিন্তু উপাসনা-কেন্দ্র অনেকগুলি। পূর্ব্বে একটী মাত্র উপাসনা-কেন্দ্র ছিল। টিস্‌কো হইতে পদব্রজে সাত মাইল হাঁটিয়া আসিয়া শ্রীমান্ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়াছে। সহর বড়, উপাসক-উপাসিকারা সহরের সকল প্রান্তে ছড়াইয়া আছে, সুতরাং তাহাদের পথক্লেশ নিবারণের জন্য পাঁচটী উপাসনা-কেন্দ্র করা হইয়াছে। সকলের পক্ষে উপাসনায় যোগদান সহজ করিবার জন্যই ইহা করিতে হইয়াছে। কিন্তু সবগুলি উপাসনা-কেন্দ্র একটী মাত্র মণ্ডলীর সহিতই যুক্ত। কৈ, তাহাদের ত' পাড়ায় পাড়ায় আলাদা মণ্ডলী হইল না বলিয়াই কাজের ক্ষতি হয় নাই। জামশেদপুর বিরাট সহর, প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস, সেখানে একটী মণ্ডলীই ত' সমগ্র সহরের কেন্দ্রগুলি আগুলিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে!

ডিব্রুগড় জামশেদপুরের তুলনায় ছোট সহর কিন্তু খোয়াই বা ধর্ম্মনগরের প্রায় বিশগুণ বড় হইবে মনে হয়। সেখানে একটীই মণ্ডলী ছিল, এখন দুইটী মণ্ডলী হইয়াছে,—একটী সহর-মণ্ডলী, অপরটী রেল-কলোনি মণ্ডলী। রেল-কলোনি মণ্ডলী দিজস্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একটী হাইস্কুল চালাইতেছেন। আর সহর

মণ্ডলীর কর্ম্মীদের মধ্য হইতেই সেই হাইস্কুল কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। সহরে একটী টুঁ শব্দ হইলে রেল-কলোনির হাজার লোক সেখানে ছুটিয়া আসে। রেল-কলোনিতে একটী তুচ্ছ অনুষ্ঠান হইলেও সহর-বাসী ধনি-দরিদ্র সকল উপাসকেরা সেখানে চলিয়া যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া পাঠ-কীর্ত্তন-উপাসনায় যোগ দিতে।

এগুলি ঐক্যের নিদর্শন।

তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন কাজ করার, এমন কথা বলার, এমন চিন্তা করার, যাহা তোমাদের ঐক্যের শক্তি, মিলনের বুদ্ধি, সংঘবদ্ধতার আগ্রহ সৃষ্টি করিবে। ব্যক্তি তুমি দুদিন পরেই থাকিবে না, হয় ব্যাধি, নয় দুর্ঘটনা, নয় অকারণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবে কিন্তু তোমাদের মিলনের ইচ্ছা, সংঘের শক্তি, অফুরন্ত প্রেম স্থায়ী জীব-কল্যাণ রূপে দিত্যকাল বিদ্যমান রহিবে। অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে যাবতীয় তামসিক জেদ প্রত্যেকে তোমরা পরিত্যাগ কর। কর্ত্তৃত্বলিপ্সু মনকে সুবিনীত কর। ঈর্ষ্যাকাতর মনকে অদোষদর্শী কর। উদ্ধত চিন্তা, অসঙ্গত বাক্য ও অসুন্দর আচরণকে সংযত কর, সুশৃঙ্খল কর, সহনশীল কর। উপায়কে লক্ষ্যের অধীন কর। আদর্শকে ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে সরাইয়া নিয়া হৃদয়ের বস্তু কর। তুমি যে সেবক, নেতা নহ, এই কথাটী বারংবার স্মরণ কর। তোমাদের অতীতের অগণিত ব্যক্তিগত আক্রোশকে পদতলে চাপিয়া মারিয়া ফেল। নিজেদের দর্পের দাপটে নহে, সেবার স্নিগ্ধতা দিয়া

মণ্ডলীকে তাহার পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবে সাজাইয়া তোল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অপ্রত্যাশিত সাফল্য ও গৌরব লাভের আশা একমাত্র তাহাদেরই করা উচিত, যাহারা ধারাবাহিক প্রযত্নে দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছে। জীবনের সাফল্য আর মহত্তম গৌরবকে লটারির টিকেটের সহিত আঁটিয়া দিতে রাজি হইও না।

চতুর্দ্দিকে কর্ম্মের মহাকলরোল সৃষ্টি কর। দুর্ব্বার করিয়া তোল তোমাদের কর্ম্মশক্তিকে আর বিশ্বতোবিস্তার দাও তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে। ক্ষুদ্রকে লইয়া নহে, ভূমাকে লইয়াই তৈরী হইবে তোমাদের আনন্দ-নিকেতন।

সকলের শক্তিকে একমুখী কর। ঐক্য আর শক্তি এক কথা জানিও। নানা জনে নানা দিকে মন দিও না। সকলের মনকে একটী স্থানে ধর। আতসী কাচ হাতে থাকিলে সাধারণ সূর্য্যালোকটুকুই অগ্নির সৃষ্টি করিবে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দাও। নিজেও নিজের দায়িত্ব পালন কর।

প্রেমই তোমার জীবনের ধর্ম্ম, প্রেমই তোমার উপায়, প্রেমই তোমার সাধনার বস্তু, প্রেমই তোমার লক্ষ্য। কদাচ অসদুপায়ে নির্ভর করিও না, কদাচ আসল সাধন ভুলিও না, কদাচ নিজেকে প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ষড়বিংশ খণ্ড
সমাপ্ত

প্রেম বিনা জীবনের সব অন্ধকার,
চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রেম ধরে মিথ্যাচার।
সাধন বিহীন শুদ্ধি বৃথা পণ্ড শ্রম,
না হয় সাধন বিনা ইন্দ্রিয়-সংযম।।

— শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ —

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মুলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা'** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

**অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০**

ISBN 978-93-94394-12-4

9 789394 394124

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা' ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-93-94394-12-4

9 789394 394124

ধৃতং প্রেমা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ষড়বিংশ খণ্ড